ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্" : একটি পুনর্মূল্যায়ন

[এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ]

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
স্নেহ বাড়ৈ
রেজিষ্টেশন নং: ১৯৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: জুলাই ২০১৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, স্নেহ বাড়ৈ কর্তৃক উপস্থাপিত ‘ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অশ্বঘোষের “বুদ্ধচরিতম্” : একটি পুনর্মূল্যায়ন’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্": একটি পুনর্মূল্যায়ন** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণার পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা অন্য কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

(স্নেহ বাড়ৈ)
এম.ফিল গবেষক
রেজিষ্টেশন নং: ১৯৪
শিক্ষাবর্ষ: ২০১২-২০১৩
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থী তখন থেকেই আমার এম.ফিল করার স্বপ্ন ছিলো। সেই স্বপ্ন পূরণের এক ধাপ অতিক্রম করতে যাচ্ছি আজ। এফ.ফিল অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করার পেছনে আমার অনেক কষ্ট ও শ্রম দিতে হয়। এই কষ্ট এবং শ্রম লাঘবের পেছনে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার অবদানকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্" : একটি পুনমূর্ল্যায়ন শিরোনাম অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করতে সক্ষম হই। বিশেষ করে তাঁর সার্বিক দিক পরামর্শ এবং নির্দেশনা ও উৎসাহের কারণেই আমি আজ আমার দীর্ঘদিনের শ্রমলব্ধ গবেষণাকর্মটি শেষ করতে পেরেছি। তিনি এগিয়ে না আসলে আমার পক্ষে গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করা সম্ভবপর হতো না। তাই আমি আজ তাঁর নিকট ঋণী। আমার গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, অধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতায়। আমি তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ কামনা করছি।

আজ পরম শ্রদ্ধা আর অসীম কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্র নাথ বাড়ৈকে। আজ এমনই এক স্মরণীয় সময়ে আমি মহান প্রভু ঈশ্বরের নিকট তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি। আমি গভীর চিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম মাতৃদেবী শ্রদ্ধেয় কনক বাড়ৈকে।

আরও স্মরণ করছি আমার বিভাগের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়দেরকে, যারা বিভিন্ন সময়ে আমাকে আমার গবেষণায় পরামর্শ দান, সহযোগিতা এবং নানাভাবে আমাকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাঁদের মধ্যে, অধ্যাপক ড. নারায়ন চন্দ্র বিশ্বাস, অধ্যাপক ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক, অধ্যাপক ড. মাধবী রাণী চন্দ, অধ্যাপক ড. নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. অসীম কুমার সরকার এবং অধ্যাপক ড. মালবিকা বিশ্বাস অন্যতম। এছাড়া বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ যারা আমাকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে পাঠদানসহ আমার গবেষণা কর্মে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত আমি সংস্কৃত থেকে স্নাতক-স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিলেও আমার এম.ফিল ডিগ্রির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছি পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সাথে, কারণ আমার ইচ্ছা ছিলো বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উপর উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করবো। তাই পরবর্তী সময়ে ঐ বিভাগের সাথে সংযুক্ত হই এবং আমি আমার এম.ফিল ডিগ্রিতে অন্তর্ভুক্ত হই। সে হিসেবে ঐ বিভাগের শিক্ষকবৃদ্ধ আমাকে যেভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন তা আমি আজ গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। তাঁরা আন্তরিকভাবে এগিয়ে না আসলে আমার গবেষণাকর্ম শেষ করতে কষ্টকর হতো। অতএব আমার এই গবেষণা কর্মে যাঁরা বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া এবং অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া অন্যতম। বলতে গেলে তাঁরা আমাকে আমার গবেষণাকর্ম করার জন্য প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এছাড়া ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়া, ড. শান্টু বড়ুয়া এবং প্রভাষক মিসেস জ্যোতিস্বী চাকমা, মো. আশিকুজ্জামান খান কিরন, রত্না রাণী দাস এবং শামীমা নাছরিনকেও। আজ আমার এই শুভ দিনে তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সংস্কৃত বিভাগের জুনিয়র গ্রন্থাগারিক উত্তম সরকার মহোদয়কে যিনি সার্বক্ষণিক বিভিন্ন পুস্তক, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছেন। এছাড়াও উপ-রেজিস্ট্রার জনাব শেখ মো: জামাল এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোহা. একরামূল হকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এছাড়া ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ ও সংস্কৃত বিভাগের সেমিনার প্রধানসহ, বাংলা একাডেমি, এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার প্রধানদেরকেও এবং ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে। তাঁরা আমাকে আমার গবেষণাকর্মে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন আমার প্রয়োজনে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ধন্যবাদ জানাই আমার অনুজ সমতুল্য মোঃ মাহফুজুল ইসলামকে। সে আমাকে কম্পিউটার কম্পোজসহ নানা কাজে সহায়তা দান করেছে। আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সকল পুস্তক ও জার্নালের সহায়তা নিতে হয়েছে সে সব পুস্তক ও জার্নালের লেখকদেরও আমি আজ কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করি। এছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ও সুধীজন বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি জানাই আমার আন্তরিক অভিবাদন ও অভিনন্দন।

পরিশেষে, আবারো মহান প্রভু ঈশ্বরের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তিনি যেন আমার এ মহান ব্রতে সহায় হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অমর হোক।

স্নেহ বাড়ৈ
এম.ফিল গবেষক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে অশ্বঘোষের "বুদ্ধচরিতম্": একটি পুনর্মূল্যায়ন

ভূমিকা	:	১-২
প্রথম অধ্যায়	: বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	৩-৪১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম	৪২-৭১
তৃতীয় অধ্যায়	: ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বুদ্ধচরিতম্ গ্রন্থের পুনর্মূল্যায়ন	৭২-৯২
চর্তুথ অধ্যায়	: বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে অলঙ্কার	৯৩-৯৭
পঞ্চম অধ্যায়	: বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে ছন্দ	৯৮-১০০
ষষ্ঠ অধ্যায়	: উপসংহার।	১০১
	গ্রন্থপঞ্জি:	১০২-১০৬

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্যজগতে 'বুদ্ধচরিতম্' অন্যতম। যেহেতু 'বুদ্ধচরিতম্' একখানা মহাকাব্য তাই প্রথমেই মহাকাব্য সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। অর্থাৎ, সর্গ দ্বারা গঠিত পদ্যময় কাব্য বিশেষকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্যে প্রথমে আশীর্বাদ স্তুতিবাক্য, প্রসংশা, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ থাকবে। কখনো কখনো আবার দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বা সাধু ব্যক্তির গুণকীর্তন থাকবে। মহাকাব্যে সর্গ বিভাগ থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা হবে আটের অধিক, সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে। কেবল সর্গের শেষে অন্য প্রকার ছন্দের পদ্য থাকবে, তবে সর্গান্তে রসের পরিবর্তন ঘটবে, বিষয় অনুযায়ী সর্গের নামকরণ করা হয়। এর প্রধান বিষয় হবে পুরাণ, ইতিহাস বা কোনো সত্য ঘটনা। মহাকাব্য পাঠে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল লাভ হবে। একটি বর্গই মুখ্য ফলরূপে বর্ণিত হবে। নায়ক ধীরোদাত্ত ও গুণসম্বলিত এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় বা দেবতা হবেন অথবা একই বংশজাত বহুরাজা। পটভূমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালপ্রসারী এবং তাতে যুদ্ধ, প্রকৃতি, নগর, সমুদ্র, সন্ধ্যা চন্দ্র, সূর্য এবং রাত্রির যথাসম্ভব বর্ণনা থাকবে। এর বিষয়বস্তু হবে ঐতিহাসিক বা কোনো সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করে রচিত কাহিনি। এতে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্ত এই তিনটির যে কোনো একটি রস হবে প্রধান এবং অন্যান্য রস হবে এর অঙ্গস্বরূপ। কবি, কাব্যের বিষয়বস্তু, নায়ক, অথবা অন্য কারো নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। নায়কের জয় কিংবা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘটবে। 'বুদ্ধচরিতম্' মহাকাব্যের এসব লক্ষণ যথার্থভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব 'বুদ্ধচরিতম্' একটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য।

অশ্বঘোষ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কবি হিসেবে পরিচিত এবং সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশাল স্থান অধিকার করে রয়েছেন। আদিকবি বাল্মীকির পর প্রথিতযশা মহাকবি হিসেবে যিনি সংস্কৃত সাহিত্য জগতকে প্রতিভার আলোকে সুমুজ্জ্বল করেছেন তিনি হলেন মহাকবি অশ্বঘোষ। তিনি জাতিতে হিন্দু হলেও পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। তিনি শুধু মহাকবি হিসেবেই পরিচিত ছিলেন না। সঙ্গীতকার, পণ্ডিত

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধর্মবিশ্বাসের প্রতি গোঁড়া এবং কঠোর শৃঙ্খলানিষ্ঠ ব্যক্তিরূপেও পরিচিত। তিনি রাজা কণিষ্কের (খ্রি. পূ. ১ম শতক) সভাকবি ছিলেন। তাঁর কাল নির্ণয় সমন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মধ্যে মত পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন: সিলভ্যাঁ লেভি-র মতে- চীনা কিংবদন্তী তাঁকে কণিষ্কের অধ্যাত্ম উপদেষ্টা করেছেন এবং ডক্টর ই.এইচ.জনস্টন-এর অভিমত- খ্রিস্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর প্রথম অর্ধেক প্রতি পক্ষপাতিত্ব রেখে যদি আমরা বলি, কবি ৫০ খ্রি.পূ. অব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বৌদ্ধ কবি এবং সাহিত্যকগণ সাধারণত পালি ভাষায় তাঁদের গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু অশ্বঘোষ মহামানব বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করে সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন মহাকাব্য রচনা করেছেন। যেমন: বুদ্ধচরিতম্, সৌন্দরনন্দ, সূত্রালংকারশাস্ত্র ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে 'বুদ্ধচরিতম্' অশ্বঘোষের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে গৃহীত। আর বুদ্ধদেবের জীবনচরিত-ই এ কাব্যের বিষয়বস্তু। তিনি তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে নিপুনভাবে বর্ণনা করেছেন বুদ্ধদেবের জীবনোতিহাস। আর এ কারণেই আমি আমার গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতম্' নির্বাচন করেছি। আমার গবেষণাপত্রের অভিসন্দর্ভটি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায় : বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায় : অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

তৃতীয় অধ্যায় : ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে বুদ্ধচরিতম্ গ্রন্থের পুনর্মূল্যায়ন

চর্তুথ অধ্যায় : বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে অলঙ্কার

পঞ্চম অধ্যায় : বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে ছন্দ

Dhaka University Institutional Repository

সর্বশেষ ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার। এ অধ্যায়ে গবেষণাকৃত বিষয়ের পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে যেখানে সার্বিক গবেষণাকর্মের আলোচ্য বিষয়বস্তুর এক সংক্ষিপ্ত সার তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়।

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

বৌদ্ধদর্শন, ধর্ম এবং সাহিত্যের ইতিহাস বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেননা বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম দর্শন নিয়ে যে পরিমাণে লেখালেখি ও গবেষণা হয়েছে আর অন্য কোনো মহাপুরুষ বা ধর্মদর্শন নিয়ে তা হয়নি। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক অমূল্য রত্নভাণ্ডার। পালি ভাষা সাহিত্য প্রচার-প্রসারে ইতিহাসে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের তাৎপর্য সমভাবেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয় বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য। বুদ্ধের জীবন ও ধর্মদর্শনকে অবলম্বন করে বুদ্ধের মহাপরিনিবার্ণের কয়েকশ বৎসর পর সংস্কৃত ও মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় যে সকল সাহিত্য রচিত হয়েছে তাকে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বলা হয়। প্রফেসর ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া বলেছেন: পালি ভাষা ছাড়া সংস্কৃত ও আধা সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেইগুলোই সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ সাহিত্য।[১] বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থকে অনুসরণ করে। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য রচনার ফলে বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিত্তি তথা বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হয়েছে। এ ভাষা সাহিত্যের কালজয়ী ইতিহাস সুদূর প্রসারি।

বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা সাহিত্যের উপয়োগিতা বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ ধারা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য। বৌদ্ধধর্ম দর্শনে মূলত প্রধান দুটি ধারা বিদ্যমান। যেমন: ক. থেরবাদী দার্শনিক ধারা এবং খ. মহাযানী দার্শনিক ধারা। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনতাত্ত্বিক ধারার মূল প্রবাহ। এতে স্থান পেয়েছে, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক বৌদ্ধতথ্য। কালের

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহমানতায় বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য একটি স্বতন্ত্রধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। Prof. Sylvian Levi-এর মতে: সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যের গ্রন্থিত ধারার অগ্রযাত্রা শুরু হয় খ্রিষ্টীয় ৩য়-৪র্থ শতকের মধ্যে। কিন্তু এ সূচনা হয় দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতির পর হতে। অর্থাৎ, খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ-৩য় শতকের মধ্যে। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশের সাথে সাথে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যও বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে।[২] সংস্কৃত ভাষা এ সাহিত্য রচনার প্রধান উপাদান। এ সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয়। বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গণে সংস্কৃত সাহিত্যের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। বিশ্ব সভ্যতার প্রথম স্বাক্ষর এই ভাষা সাহিত্যে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ বা বৈদিক সাহিত্য যে ভাষায় চিত হয় তা থেকেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি। প্রাচীন ভারতীয় সনাতন হিন্দুদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়।[৩]

সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক ও বিস্মৃত। ধর্মীয় গ্রন্থ, কাব্য, গীতি কবিতা, নাটক, গল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান, ছন্দ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষ, আইন, এমন কোনো বিষয় নাই যেখানে সংস্কৃত ভাষা পদচারণা করে নাই। তাই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত M. winternitz তাঁর A History of India Literature, Vol-1 গ্রন্থে বলেছেন: 'In aphorism (Gnomic Poetry), the Indians have attained a mastery which has never been gained by any other nation. The Indian collections of fairy tales, fables and prose narratives have played no insignificant part in hte history of world literature, Centuries before the birth of Christ, grammar, was already studied in India, a science in which the Indians excel all the nations of antiquity, Lexicography too attains to a high age.'[৪]

মণ্ডূকী গৌরী ধর্মপাল-স্বল্পিকা শিলীন্ধ্রের ব্যাঙের ছাতা একছত্র কালিদাসের এক ছত্তর এ লিখেন 'ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস বাণভট্ট, ভবভূতি এই পঞ্চ মহাকবির মধ্যে ব্যাস-বাল্মীকি লিখেছেন প্রাক্-সংস্কৃত। পাণিনির সূত্রে তা হয় ভাষা। বৈদিক উত্তর এ সর্বজনীন 'ভাষা' ভেঙ্গে 'পালি' হয়ে গেল। বেদের ঋষি-কবিদের ভাষা 'ছন্দস' পাণিনি-যাস্কের ভাষা 'ভাষা' আর মিশ্রণ বর্জিত পরিশীলিত ভাষা 'সংস্কৃত' একই ভাষা। বেদ থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতভাষা তার থেকে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাকৃত, তার থেকে আধুনিক। অন্তত ৮০০০ বছর ধরে চলছে আমদের প্রাণ প্রবাহিনী এই ভাষা।[৫]

ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে: সংস্কৃত ভাষা কোনো দিনই কথ্য ভাষা ছিলো না; ছিলো সাহিত্যে ব্যবহৃত একটি অলঙ্কৃত ভাষা। তবে যাস্ক ও পাণিনি সংস্কৃত ভাষাকে লৌকিক ভাষা বলতেন। পাণিনির অষ্টধ্যায়ী ব্যাকরণ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য নামক ব্যাকরণ গ্রন্থে দেখা যায় সংস্কৃত ভাষা সাধারণ জনমানুষ ও সাহিত্যের অলঙ্কৃত ভাষা ছিলো। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ছিলো একটি জীবন্ত ভাষা। এক সময় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। ড. ফয়জুন্নেছা বেগম বলেছেন, 'সংস্কৃত' শব্দটিতে সংস্কার বা refinement এর একটি ভাব আছে। পূর্বের একটি ভাষা থেকে refined হয়ে সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে।[৬] সাহিত্য ইতিহাসে দেখা যায়, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ঋষি, রাজা, মন্ত্রি প্রভৃতি উচ্চশ্রেণির লোকেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু স্ত্রীলোক ও সাধারণ লোকের ভাষা ছিলো প্রাকৃত। ইহাতে বলা যায়, সংস্কৃত সমাজের উচ্চশ্রেণির এবং শিক্ষিত শ্রেণির ভাষা ছিলো।

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বিবরণী হতে জানা যায় যে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা তাঁদের ধর্মবিষয়ক আলোচনা সংস্কৃত ভাষাতেই করতেন। তাঁর সময়ে সরকারী কাজ কর্ম সংস্কৃত ভাষায় চলত। সংস্কৃত বর্তমান আধুনিক অনেক ভাষারই উৎস। নানা বিস্ময়কর সম্পদ সংস্কৃত সাহিত্যে সঞ্চিত রয়েছে। সংস্কৃত ভাষা প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত কালজয়ী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইস্টাইন বলেছেন: "Who says Sanskrit is the dead language? It is the sole living language in the world. অর্থাৎ, কে বলে সংস্কৃত প্রাণহীন ভাষা? পৃথিবীতে একমাত্র জীবন ভাষা হলো সংস্কৃত।"[৭] ভাষাতত্ত্বের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, জনগণের তথা প্রাকৃতজনের ভাষা প্রাকৃত। আর এরই সংস্কার সাধন করে শিক্ষিত, ভদ্র ও শিষ্ট জনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েয়ে সংস্কৃত ভাষা। এটি বহুপ্রচলিত অভিমত। এ বিষয়ে অবশ্য ব্যাকরণবিদ হেমচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, 'সংস্কৃত হচ্ছে মূল ভাষা বা প্রকৃতি-তা থেকে জগত বা উৎপন্ন এই অর্থেই প্রাকৃত।'

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য পণ্ডিত Maurice Winternitz বলেন: "The Sanskrit is a 'high language' or 'class language' or 'literary language'- Whatever we may call it in contrast to the actual language of the people the Indians themselves express through the name 'Sanskrit'. For Sanskrit- Sanskrit, as much as made ready, ordered, prepared, prefect, pure, Sacred',-signifies the noble or Sacred language in contradiction to 'Prakrit'- Prakrit, as much as 'Original, natural, ordinary, common',-which signifies the common language of the people."[৮]

আবার M. Winternitz এর মতে, এ সংস্কৃত ভাষাকে সুবিধার জন্য লৌকিক সংস্কৃত বা Classical Sanskrit নামে আখ্যায়িত করা হয়। লৌকিক জীবন থেকে এ সংস্কৃত ভাষা আহরিত বলেই একে লৌকিক সংস্কৃত বলে। মহামুণি পাণিনির 'অষ্ট্যাধ্যায়ী' ব্যাকরণ দ্বারা শাসিত ভাষাই একমাত্র লৌকিক সংস্কৃত। এর আরেক নাম 'ধ্রুপদী সংস্কৃত'। রামায়ণ-মহাভারত নামক ইতিহাস পুরাণে তথা মহাকব্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ লেখকদের সংস্কৃত ভাষা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত','সৌন্দরনন্দ' প্রভৃতি রচনার কাব্যিক ভাষা।

২. ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান, অবদান শতক, বোধিসত্ত্বাবদান প্রভৃতি রচনার গদ্য অংশের ভাষা।

৩. মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তর ও সদ্ধর্মপুণ্ডরীক এর কাব্যাংশের ভাষা।

প্রথম শ্রেণির ভাষার সঙ্গে পাণিনিয় সংস্কৃতের অমিল সামান্য। বেশি অমিল দ্বিতীয় শ্রেণির রচনার ভাষায়। অল্প-সল্প ব্যাকরণ দুষ্ট ও উপভাষাগত প্রয়োগ এবং মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার রীতি অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় শ্রেণির রসের ভাষাকেই যথার্থ বৌদ্ধ সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণভাবে একে একদা বলা হতো 'গাথা ভাষা', এখন বলা হয় মিশ্র সংস্কৃত। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ সংস্কৃত অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া আদি ভারতীয় আর্যভাষার রাকরীতির অনেক ছাঁট-ছোঁট ও নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বাগধারার অনেক নবাঙ্কুর এতে স্বীকৃত হয়েছে।[৯] সুমন কান্তি বড়ুয়া উল্লেখ করেছেন, প্রাচীন ইতিহাস-ঐহিত্য ও শেকর সন্ধানী গবেষক ঐহিহাসিক মহামহোপাধ্যায় অশ্বঘোষের সাহিত্যের ভাষাকে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা' নামে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ মত প্রকাশ করেন ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সনে। প্রাচ্যের

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক Prof. T.W. Rhays Davids অশ্বঘোষের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষাকে সৌষ্ঠব মণ্ডিত পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১০]

সাহিত্যালোচনায় দেখা যায়, প্রাকৃত-পালি-শৌরসেনী-অর্ধমাগধী ও সংস্কৃত সমভিব্যবহারে চলমান সময়ে অশ্বঘোষ বহুল প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে তাঁর কাব্য, নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনায় সংস্কৃত ও মিশ্র সংস্কৃত ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। এ ভাষায় সকল মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে। তাই এ ভাষার গুরত্ব ও উপযোগিতা রয়েছে।

কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হতে সংস্কৃত ভাষা নিজস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই ভাষায় রসসমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে তা নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা অসম্ভব। বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য থাকলেও বৈদিক যুগের পুরোহিত তন্ত্রের ভাষার প্রকৃতি লৌকিক সংস্কৃত হতে পৃথক। পাণিনির ব্যাকরণে 'ভাষা' নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ দেখা যায়। পণ্ডিতগণ মনে করেন এই 'ভাষা'ই শিষ্ঠাজন ব্যবহৃত লৌকিক সংস্কৃত। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণও বলেন, বৈদিক যুগে জনসাধারণের মুখে ভাষার একটি কথ্য রূপ ছিলো, আর শিক্ষিত শিষ্টজনের মধ্যে আর একটি ভাষার ব্যবহার ছিলো। শেষোক্ত ভাষাটি বৈদিক ভাষারই একটি সুসংস্কৃত রূপ-অপেক্ষাকৃত সহজ ও সরল। এটিই সংস্কৃত ভাষা। এই সংস্কৃত ভাষায় আবার একটি সুবিশাল রস-সমৃদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠেছে। বিষয়বৈচিত্র্যে, চিন্তাশক্তির বর্ণাঢ্যে ও প্রকাশ নৈপুণ্যে এই সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যেরও গৌরব এবং বিশ্বপণ্ডিতমহলে সমাদৃঢ়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একটি সুসমৃদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এর আদি পর্বের ইতিহাস প্রায় বিস্মৃত। বিকাশ পর্বে এর যে প্রদীপ্ত ছটা, তারও কালনির্ণয়ের অভ্রান্ত কোনো সঠিক সন্ধান নেই। স্থুলভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই সাহিত্যের কালসীমা ধরে একে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। যেমন: আদিপর্ব, সমৃদ্ধিপর্ব ও অবক্ষয় পর্ব। নাম আদিপর্ব হলেও কিন্তু এর পটভূমিকায় বেদ-পুরাণ-ইতিহাসের সুসমৃদ্ধ উপকরণ থাকায় সংস্কৃত সাহিত্য শৈশব হতে প্রৌঢ় বলে মনে হয়। আচার্য Maxmuller তাঁর বহুখ্যাত Renaissance Theory দ্বারা প্রতিপন্ন

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন শক-সিথিয়ানদের আক্রমনে এদেশে এমন একটা বিশৃঙ্খলা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, খ্রিস্টীয় ষষ্ট শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের কোনো উল্লেখযোগ্য চর্চা এদেশে সম্ভব হয় নাই। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সংস্কৃত ভাষা সাাহিত্যের পুনর্জাগরণ ঘটে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শুরুও সেই সময় হতে।[১১] আচার্য Maxmuller এর এই তত্ত্ব খন্ডিত হয়েছে। কবি কালিদাসের কাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগে বলে নির্মিত হয়েছে এবং খ্রি.পূ. অব্দ হতে যে সংস্কৃত কাব্য নাটক রচিত হয়ে আসছে, তারও প্রমাণ মিলতেছে। তবে একথা সত্য যে, গুপ্তরাজত্বের অভ্যুত্থানের পূর্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রবল বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলো। এই সময় প্রাকৃত ভাষা, বিশেষতঃ পালিভাষার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি হয়। তারপরও তা সংস্কৃতের চর্চাকে তেমন রুদ্ধ করতে পারেনি। ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিলো আবার অমেয় প্রাণশক্তির অধিকারী। বররুচির মত কবি, চাণক্যের মত কঠোর রাজনীতিবিদ্ ও পতঞ্জলির মতো ভাষ্যকার ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব কোনোকালেই হয়নি। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধগণ পালির পরিবর্তে সংস্কৃতকে (মিশ্র সংস্কৃত) ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করায় সংস্কৃতের চর্চায় কোনো ছেদও পড়েনি। সংস্কৃত সাহিত্যের আদিপর্বেই ভারতের নাট্যশাস্ত্র, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নের বার্তিক (পাণিনির টীকা) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও নীতিশ্লোক, বাৎস্যায়নের কামসূত্র (কেউ কেউ মনে করেন, চাণক্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন) এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়েছে। সে সময় কাব্য, নাটক, খণ্ডকবিতা ও গল্পসাহিত্যও প্রচলিত ছিলো। কথিত আছে, স্বয়ং পাণিনি 'জাম্ববতী জয়' নামক কাব্য রচনা করে ছিলেন। এরপর মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' কাব্য রচিত হয়েছে ঐ সংস্কৃত ভাষায়। সে সময় নাট্য সাহিত্যেরও অভাব ছিলো না। পাণিনির ব্যাকরণের 'নটসূত্র' প্রমাণ করে, তাঁর সময়েও নাটক প্রচলিত ছিলো। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি এই 'নটসূত্রে'র ভাষ্যে এমন কতগুলো কথা বলেছেন যাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তৎকালে নাট্যকলাও সুসমৃদ্ধ ছিলো। সে সময় অশ্বঘোষের নাটক ও ভাসের নাট্যচক্র আবিষ্কৃতও হয়েছে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যান বর্ণনায় দক্ষ যাবক্রীতিক, যাযাতিক, বাসবদত্তিক প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। পালি সূত্র পিটকের দীর্ঘনিকায়ের 'বম্ভজাল সুত্রে' ও- রাজ-কথা, চোর-কথা, যুদ্ধ-কথা, গ্রাম-কথা, নারী-কথা প্রভৃতি কথার উল্লেখ রয়েছে। তা দ্বারা কালিদাসোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উদয়ন-কথা-কোবিদ্‌গণের আলাপ্য কথাসাহিত্যও যে সে যুগে প্রচলিত ছিলো, তা সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

এই আদি পর্বের সংস্কৃত সাহিত্যে যা পাওয়া গেছে, তা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও শিল্প-নৈপুণ্যের-স্বাক্ষর বহন করে। অলংকার শাস্ত্রের কঠিন নিয়ম তখনও সাহিত্যের উপর চেপে বসে নি; তাই এই পর্বের সাহিত্যে একটি আকৃত্রিম সৌন্দর্য ও প্রাণ-শক্তির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছিলো শতক সংস্কৃত সাহিত্যের সমৃদ্ধির যুগ। এ সময় কবি নাট্যকার কালিদাসকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত রস সাহিত্য চর্চা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো। তখন গুপ্তসম্রাটগণ ছিলেন রাজচক্রবর্তীর আসনে সমাসীন। নবরত্ন সমন্বিত হয়ে তাঁরা রাজসিংহাসনে উপবেশন করতেন। কাব্যকথা ও রসকথায় রাজসভা পূর্ণ হয়ে উঠত। ভারতবর্ষের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিলো তখন ঐশ্বর্যে ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা নির্ভর সাহিত্যও তাই এ যুগে জয়গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার কালিদাস ছিলেন।

বলতে গেলে সপ্তম হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছয়শত বছর সংস্কৃত সাহিত্যের কৃত্রিম কাব্যকলা ও অবক্ষয়ের যুগ। তন্মধ্যে সপ্তম হতে দশম শতাব্দীকে বলা চলে কৃত্রিম কাব্যরীতির যুগ। এ সময়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের গগণচুম্বী ঊর্মি আবার অধোগামী হয়েছে। কৃত্রিমতায় ও অলংকরণের বাহুল্যে সাহিত্য তার প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারপরও এর ভিতর কিছু সাহিত্য দাবি করতে পারে। ভারবি, ভট্টি, বাণ, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি সাহিত্যিক এ যুগের প্রথিতযশা কবি ছিলেন।

একাদশ-দ্বাদশ শতকে সংস্কৃত সাহিত্যের ভাবের দীনতা ও ভাষার কৃত্রিমতা চরমে উঠে। এটাই প্রকৃত অবক্ষয় যুগ। যে রস-সাহিত্য ছিলো বিশুদ্ধ প্রেম ও সৌন্দর্যের বাহন, তা দেহগত শৃঙ্গারের পোষকতায় কামায়ন প্রচুর সাহিত্যে পরিণত হয়েছে। এমন কী শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমারেখা চূর্ণ-বিচূর্ণ। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ও সাহিত্যে ছিল শিথিল। এমনকি রাজসভায় ষড়যন্ত্র ও বিশৃঙ্খলা, সমাজেও নীতিহীনতার কারণে সাহিত্য ক্রমশ তার প্রাণ হারায়। এতো

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিকূলতার মধ্যেও এ যুগের সোমদেবের কথাসরিৎসাগর শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিত, কহলণের রাজতরঙ্গিনী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি সু-সমৃদ্ধ ধারা। কালের পরিক্রমায় বৌদ্ধধর্ম দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত যার একটি রূপ দেখা যায় ভারত, বাংলাদেশ, মায়নমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া লাওস দ্বীপময় ভারতে। তাদের ধর্ম গ্রন্থ ছিলো পালি ত্রিপিটক তথা আদর্শ থেরবাদ এবং এদের উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গ শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শাখাকে Southern Buddhism বা দক্ষিণাপথের বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করেছেন।

বৌদ্ধধর্মের অন্য একটি রূপ পরিলক্ষিত হয়, নেপাল চীন, জাপান, কেনিয়া, সিংগাপুর, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া প্রভৃতি পথে। তাদের ধর্মগ্রন্থও ছিলো মূলত: পালি ত্রিপিটক: কিন্তু এই ত্রিপিটক ছিলো পরিবর্তিত এবং মিশ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত। সেখানে ধর্মের লক্ষ্য ও উপায়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান বুদ্ধ সেখানে ছিলেন পরম দেবতা তাঁর সংখ্যা ছিলো অসংখ্যা এবং শক্তিও অলৌকিক অসংখ্য বোধিসত্ত্বগণ সেই দেবতার ধ্যানে তন্ময় ও কল্যাণ মৈত্রীর একই আদর্শ অনুপ্রাণিত ছিলেন। এই বোধিসত্ত্বই এই সম্প্রদায়ের আদর্শ এবং এদের উদ্দেশ্য ছিলো প্রজ্ঞা পারমিতার অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করা। এই বৌদ্ধ ধর্মকে বলা হয় Northern Buddhism বা উত্তরাপথের বৌদ্ধধর্ম।

উপরে উল্লেখিত নাম দুটি কপোল-কল্পিত। কেননা ত্রিপিটক সাহিত্যে কোথাও হীনযান ও মহাযান শব্দ নেই। মহাযানরা নিজেদেরকে মহাযানী এবং অন্যদেরকে হীনযান বলে সম্বোধন করেছেন। এদের নামকরণ সম্ভবত রাজা কণিষ্ক সঙ্গীতি হতে। খ্রিস্টপূর্বাব্দেও আবার বৌদ্ধসংঘে ভেদ বিদ্যমান ছিলো। শাখা ভেদে এদের আবার নাম ছিলো স্থবিরবাদ, হৈমবাদ, ধর্মগুপ্ত, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সর্বাস্তিবাদ, মূল সর্বাস্তিবাদ, মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোওরবাদ প্রভৃতি এভাবে ১৮টি নিকায় বা শাখা প্রশাখার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মতবাদে ও পথে বেশ কিছু পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

ছিলো। এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য ছিলো খুবই স্পষ্ট। মহাযানদের বীজ হলো এই মহাসাঙ্ঘিক ও লোকোওরবাদ। এদের যে গ্রন্থগুলো ছিলো তা পাওয়া যায় বৌদ্ধসংস্কৃতে এবং এইগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে নেপাল, কাশ্মীর, তিব্বত ও চীন দেশে।

বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলোকে আবার দুভাগে বিভক্ত করা যায়। একভাগ হীনযান মতের গ্রন্থাবলী অন্যভাগ মহাযান মতের গ্রন্থাবলী। হীনযান মতের গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. মহাসাঙ্ঘিক লোকোওরবাদ সম্প্রদায়ের 'মহাবস্তু'
২. ধর্মগুপ্ত সম্প্রদায়ের 'বুদ্ধচরিতম্' এবং
৩. সর্বাস্তিবাদীদের 'অবদান সাহিত্য'

[(i) অবদানশতক (ii)বিদ্যাবদান ও (iii) অবদানকল্পতা প্রভৃতি]। এই গ্রন্থগুলো কিন্তু হীনযান এবং মহাযানদের সন্ধি হিসেবে বিবেচিত।

মহাযান মতের গ্রন্থাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

(i) ললিতবিস্তর (ii) সদ্ধর্ধপুণ্ডরীক (iii) প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যাদি। এছাড়াও পরবর্তীকালে নাগার্জুন, অসঙ্গ বসুবন্ধু এবং শান্তিদেবের রচনাবলী উল্লেখযোগ। নিম্নে বৌদ্ধসংস্কৃতে উল্লেখিত কতগুলো গ্রন্থের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো। যেমন:

হীনযান বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ

মহাবস্তু: মহাসাঙ্ঘিক-লোকোওরবাদ সম্প্রদায়ের তথা বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'মহাবস্তু' বা 'মহাবস্তুবদান'। এই গ্রন্থকে বুদ্ধজীবনী এবং বুদ্ধ জীবনাদর্শের মহাকোষ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে (৬৫০-১২০০) রচিত চর্যাপদের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম যেমন, ১৮৮২ সালে প্রকাশিত 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' গ্রন্থে নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের কথা প্রকাশ করেন তদ্রুপ তিনি বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাবস্তু' সমন্ধে যে মতামত প্রদান করেন তাও সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহনযোগ্য ছিল। তিনি বলেন, 'A Cyclopaedia of Buddhist legends and doctrines'-[১২] অর্থাৎ, এটা একাধারে নিদানকথা, জাতক, অবদান (বৌদ্ধ আচার্য ও ভিক্ষুগণের অতুলনীয় কীর্তি), বুদ্ধবচন এবং ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচার-আচারণনীয় ধর্মের মহাগ্রন্থ। বহুখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর E'senart আবার এই গ্রন্থকে তিনটি ভাগে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। যথা- প্রথম খণ্ড- 'দূরেনিদান' এতে বুদ্ধের অতীত জীবনের কর্মকাহিনি এবং সুমেধতাপসের প্রণিধান বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ড - 'অবিদূরেনিদান'- এখানে বুদ্ধের জন্ম হতে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বর্ণনা এবং তৃতীয় খণ্ড - 'সন্তিকোনোদান' অর্থাৎ, বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তনের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। উল্লেখিত বিদ্যমান এগুলো গদ্যে ও পদ্যে বর্ণিত এবং ভাষা সব স্থানে ভাঙ্গা সংস্কৃত।

যেকোনো গ্রন্থ, কবিতা, নাটকের প্রধান আকর্ষণ হলো কাহিনি। 'মহাবস্তু'- গ্রন্থ ও এর ব্যতিক্রম নয়। এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও সাহিতিক মূল্য উপেক্ষণীয় নয়। 'মহাবস্তু' শুধু বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বাংলাসাহিত্যের লেখকদের ছোঁয়াও এতে পরিলক্ষিত হয়। তাইতো বাংলাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ট কবি, ঔপন্যাসিক গল্পকার, প্রবন্ধকার, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, অভিনেতা, চিত্রশিল্পী, নাট্যপ্রযোজক ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মহাবস্তু' অবদানের কিছু কাহিনিকে আশ্রয় করে অপূর্ব কবিতা ও নাটক রচনা করেছেন, নিম্নে সংক্ষেপে সে কাহিনিগুলোর উল্লেখ করা হলো। যেমন :

- মালিনীর কাহিনি
- শ্যামজাতক কাহিনি- [বজ্রসেন শ্যামার কাহিনি] এই জাতকের শ্যামা হলেন এ জন্মের যশোধারা এবং বজ্রসেন হলেন স্বয়ং বুদ্ধ
- কুশজাতক [কুশ ও রাণী সুদর্শনার কাহিনি] এখানে কুশ হলেন স্বয়ং বুদ্ধ, সুদর্শনা এ জন্মের যশোধরা এবং 'দুর্মতি' পাপী- মার

Dhaka University Institutional Repository

- আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক [কোশলরাজ ও কাশীরাজের কাহিনি]
- এখানে পূর্বজন্মে বুদ্ধই ছিলেন কোশলরাজ অন্যদিকে কৌন্ডিণ্য ছিলেন সার্থবাহ।

উপরে উল্লেখিত জাতকগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, বহুল আলোচিত গ্রন্থ মহাবস্তুকে মানুষের চিত্তাকর্ষণ উপাখ্যানের অমূল্য ভান্ডার হিসেব অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক মূল্য বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

অবদান সাহিত্য : বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে এই গ্রন্থখানি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় বাস্তব জীবনের বিভিন্ন ধরনের রসপূর্ণ গল্প। অবদান বলতে আমরা বুঝি। 'স্মরণীয় কীর্তি' (Noteworthy deed): অর্থাৎ, বৌদ্ধ আচার্য, শ্রমণ, ভিক্ষু এবং উপাসকদের উল্লেখযোগ্য পুণ্য কর্ম বা কুশলজাত কর্ম। পালি সাহিত্যে বিদ্যমান অবদান সাহিত্য এবং সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান অবদান সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় একই।

নেপাল হতে এ ধরনের বহু অবদান সাহিত্য আবিষ্কৃত হয়েছে। রাজেন্দ্র লাল মিত্র তাঁর Sanskrit Buddhist Literature of Nepal- গ্রন্থে অবদান শতক, দিব্যাবদানমালা, বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, দ্বাবিংশ অবদান ও কল্পদ্রুমাবদান প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেছেন। এ পরিচিতি হতে অবদান সাহিত্যের উপকরণ আবিষ্কার করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এ সাহিত্যিক উপকরণ থেকে কাহিনির বীজ মাত্র নিয়ে অতি চমৎকার কবিতা ও নাটক রচনা করেছেন।

i) অবদান শতক: অবদান গ্রন্থগুলোর মধ্যে এটি প্রাচীনতম। এটি দশটি সর্গে বিভক্ত। প্রত্যেক সর্গে দশটি করে কাহিনি বিদ্যমান। কয়েক কাহিনির সংস্কৃত মূল এখনও অনাবিষ্কৃত। গ্রন্থটি বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ হিসেবে অনুমিত। প্রায় প্রত্যেকটি কাহিণির প্রারম্ভে 'বুদ্ধো ভগবান্ সৎকৃতো মানিত: পূজিতো..... বিহরতি' এই বাক্য এবং পরিশেষে ভগবান বুদ্ধের নীতি উপদেশ এবং ভিক্ষুদের সানন্দ অভিনন্দন।

Dhaka University Institutional Repository

ii) দিব্যাবদান : অবদান গ্রন্থগুলোর মধ্যে আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'দিব্যাবদান'। বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা, শার্দূলকর্ণাবদান, অশোকাবদান প্রভৃতি অবদান সাহিত্যের কাহিনিও দিব্যাবদানে সংগৃহীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যে কাহিনিগুলো নিয়ে কবিতা নাটক রচনা করেছেন, নিম্নে সে কাহিনিগুলোর নাম দেয়া হলো :

iii) মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ

সংস্কৃতে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি রচনা করার কীর্তি প্রধানত: মহাযান-পন্থী বৌদ্ধদের। হীনযান শাখার অন্তর্ভূক্ত বলে যাদের নামে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় (যেমন: মহাবস্তু, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং অবদান সাহিত্য) তাতে মহাযান মতের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। বৌদ্ধসংঘে কালক্রমে বহু ব্রাহ্মণ প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, মহাযান তাঁদেরই সৃষ্টি। বৌদ্ধধর্মের ব্রাহ্মণ্যরূপটিই 'মহাযান'; এর শাস্ত্র ও তত্ত্বে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র ও তত্ত্বের প্রভাব। মহাযান বহুল পরিমাণে পুরাণ ও হিন্দুদর্শনের তত্ত্ব আত্মসাৎ করেছে। তাদের গ্রন্থাদিও রচিত হয়েছে ব্রাহ্মণ্য ভাষায় অর্থাৎ, সংস্কৃতে। যে সুগত বুদ্ধে আদৌ দেখা গেছে 'সম্যক সম্বুদ্ধ' আদর্শ মানুষের ভাব, আচার-আচরণ তিনি মহাযানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন স্বয়ম্ভূ ভগবান রূপে, তাঁর অত্যাশ্চর্য অলৌকিক শক্তি। এই মহান্ দেবতাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধধর্মে দেব-বাদ, ভক্তিবাদ ও দেবার্চনপদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে নির্বাণের আদর্শ প্রায় বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বে পর্যবসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, মহাযান শাখাতেই যোগাচার, তন্ত্রাচার ও অসংখ্য দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হয়েছে। 'বৌদ্ধতন্ত্রে'- এর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তার আভাস দিয়েছি। এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে সংস্কৃত গ্রন্থগুলোতে মহাযানমত প্রথমতঃ স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছিলেন, তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেয়া হলো : ললিতবিস্তর : গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত বৌদ্ধ সংস্কৃতে গ্রথিত বুদ্ধ জীবনী। এটি ২৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত, শেষ অধ্যায় গ্রন্থ-প্রশস্তি। একে বলা হয়েছে 'ললিত বিস্তরো নাম মহাপুরাণম্'। বস্তুত: পুরাণে যেমন পাওয়া যায় অতিকথন, অতি আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা নিচয়ের সমাবেশ ললিতবিস্তরও তেমনিই ভগবান বুদ্ধের অতিলৌকিক জীবনকাহিনি।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের জন্ম হতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত জীবনী এতে বিবৃত হয়েছে। বুদ্ধ জীবনের মূল ঘটনাগুলো পালিসাহিত্যে -বিবৃত ঘটনাবলী হতে স্বতন্ত্র নয়; বরং স্থানে স্থানে তা পালি নিদানকথার বা বিনয় পিটকান্তর্দত মহাবর্গের সংস্কৃত প্রতিধ্বনি।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক:- মহাযান শাখার বহুবিখ্যাত 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'। এটি মহাযান সূত্র সমূহের 'শিরোমণি'। এই গ্রন্থ ললিত বিস্তরের মত বুদ্ধদেবের জীবনী নয়, এতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, ও বৌদ্ধধমনির্দেশের মাহাত্ম্য-কাহিনি। মহাযান গ্রন্থগুলোর ভিতর 'লঙ্কাবতার' 'প্রজ্ঞাপারমিতা', 'সুখাবতীব্যুহ', 'জাতকমালা প্রভৃতি গ্রন্থ বিখ্যাত।

বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থ তালিকা

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ কালে কালে রচিত হয়েছে। এ মূল্যবান সাহিত্যকর্ম বৌদ্ধ সাহিত্য, পালি ত্রিপিটক সাহিত্য তথা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও পূর্ণতা দিয়েছে। যদি সার্বিকভাবে এ সকল গ্রন্থের ক্রমানুবিকাশ তালিকা তৈরি করা হয় তা অনেক বেশি দীর্ঘতা হবে। নিম্নে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের গ্রন্থের নামের সংক্ষিপ্ত তালিকা সরণি আকারে প্রদত্ত হলো :

১। সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক

২। মহাযান সূত্র

৩। লংকাবতার সূত্র

৪। ললিতবিস্তর

৫। প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্র

৬। সমাধিরাজ সূত্র

৭। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র

৮। কারণ্ডব্যূহ সূত্র

৯। দশভূমিক সূত্র

Dhaka University Institutional Repository

১০। রত্নকূট

১১। সুখাবতীব্যূহ

১২। গণ্ডব্যূহ সূত্র

১৩। মহাযান বিংশিকা

১৪। পদ্যচূড়া মণি

১৫। বিমলকীর্তি নির্দেশ সূত্র

১৬। মহাবস্তু

১৭। দিব্যাবদান

১৮। অবদানশতক

১৯। অবদানকল্পলতা

২০। কর্মশতক

২১। অশোকাবদান

২২। রত্নাবদানশালা

২৩। ব্রতাবদানমালা

২৪। সুবর্ণ বর্ণাবদান

২৫। অবদান সার সমুচ্চয়

২৭। অবতংসক সূত্র

২৮। পরিপৃচ্ছা সূত্র

২৯। রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা

৩০। অক্ষোভ্যব্যূহ ও করুণা পুণ্ডরিক

৩১। মৈত্রীকনাবদান

Dhaka University Institutional Repository

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ সংগীতির গভীর ও নিবির সম্পর্ক রয়েছে। তাই এখানে বৌদ্ধ সংগীতি সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা হয়।

বৌদ্ধ মহাসংগীতি

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বৌদ্ধ সংগীতির গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা বুদ্ধ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারের ইতিহাসে বৌদ্ধ মহাসংগীতির বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম বিনয়, বুদ্ধশাসন, বৌদ্ধ ইতিহাস ঐতিহ্য, সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি সমস্ত কিছু বর্তমান সময়ে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় একমাত্র সংগীতি আয়োজনের মাধ্যমে। বৌদ্ধধর্মের সমস্ত কিছুর সংরক্ষক, ধারক, বাহক, সাক্ষী ও দাবিদার হলো এই সংগীতি। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সংগীতি ভূমিকা অপরিসীম ও অত্যাধিক।

সংগীতি (Council) একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। সাধারণ ভাবে এর অর্থ ভিন্ন হলেও বৌদ্ধধর্ম সাহিত্যে এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সংযম-√গম+তি=সংগীতি। সংগ্রহ অর্থে সংগীতি। সম-গীত সন্ধি অন্বয় থেকে সঙ্গীতি। বৌদ্ধ মতে সংগীতি অর্থ ধর্মসভা, সমাবেশ, সম্মেলন, সঙ্গায়ন, অধিবেশন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যেখানে গীত হয়, ধর্মীয় মুর্চ্ছনা হয়, ধর্মীয় কোন বিষয়ে আলোচনা হয় সে অর্থে সঙ্গায়ন। অর্থাৎ একত্রে বা সমস্বরে যা আবৃত্তি করা হয় তাই সংগীতি। একে আবার মহাসংগীতিও বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বৌদ্ধ সংগীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত কতগুলি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে সম্পর্কে পণ্ডিত ও গবেষক মহলে মতানৈক্য রয়েছে। কারো কারো মতে : এ পর্যন্ত মোট তেরটি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। আবার কারো মতে : নয়টি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।[১৩]

বৌদ্ধ দৃষ্টিকোণ থেকে সংগীতির তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সংগীতির মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের ছড়ানো-ছিটানো অমৃত বুদ্ধবাণী ও ধর্ম-বিনয় সমূহ সংশোধন, সংযোজন ও সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিলো। এ পর্যন্ত কতগুলা বৌদ্ধ সংগীতি হয়েছিলো তার সঠিক তথ্য সম্পর্কে পণ্ডিত সমাজে বহু মতবিরোধ ও সংশয় বিদ্যমান। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সকল বৌদ্ধ এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, সর্বমোট ৬টি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] এগুলো যথাক্রমে তিনটি ভারতে-প্রথম সংগীতি রাজগৃহ, দ্বিতীয় সংগীতি বৈশালী, তৃতীয় সংগীতি পাটলিপুত্র, চতুর্থটি সিংহলে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংগীতি বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার)। তবে মহাবংশ ও সিংহলি তথ্য মতে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংগীতি অধিবেশন হয় সিংহলে যথাক্রমে রাজা দেবানমপ্রিয় তিষ্য, রাজা দুট্টগমনীর এবং রাজা বট্টগমনী আমলে। এ সকল সংগীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক পাঠ সংগ্রহ ও ভূর্জপত্রে লেখা হয়। সম্রাট কনিষ্কের সময়ে বসুমিত্রের সভাপতিত্বে জালন্ধরে (Jalandhar) কণ্ডল বন বিহারে মহাযানীদের চতুর্থ সংগীতি আয়োজন করা হয়। এ সংগীতির সহ সভাপতি ছিলেন মহাকবি অশ্বঘোষ।

আবার বর্মী ইতিহাস ও তথ্যানুসারে পঞ্চম বৌদ্ধ মহাসংগীতি বার্মার মান্দালয়ে রাজা মিনডন মিন এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়।

এ সংগীতির পর ত্রিপিটক গ্রন্থসমূহ মান্দালয়ে ৭২৯ টি মার্বেল পাথরে খোদাই করে রাখা হয়। এ ছাড়াও ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে ব্রহ্মদেশে যে ষষ্ঠ বৌদ্ধ মহাসংগীতির অধিবেশন বসে এতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি ও টেপরেকর্ড করা হয়।[১৫] শ্যাম (বর্তমান থাইল্যাণ্ড) কিংবদন্তি অনুসারে মোট নয়টি সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রথম তিনটি ভারতবর্ষে, চতুর্থ থেকে সপ্তম পর্যন্ত সিংহলে এবং অষ্টম ও নবম সংগীতি হয় শ্যাম দেশে। আবার সিংহলি মহাবংস গ্রন্থ মতে, চতুর্থ ও পঞ্চম সংগীতি হয় সিংহলে।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এ সংগীতগুলো এক একটা কালের অমূল্য অধ্যায় বিশেষ। কারণ এই সমস্ত সংগীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক পঠিত ও সংগৃহীত হয়।

সংগীতি আহ্বাণের কারণ ও গুরুত্ব

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সংগীতি আহ্বাণের কারণ ছিলো গুরুত্ব ও অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। মূলত বৌদ্ধধর্ম বাণী সংরক্ষণ ও বিস্তারের মূলে চারটি বৌদ্ধ মহাসংগীতি পর্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিপিটকের বিনয় চুল্লবর্গে এ বৌদ্ধ মহাসংগীতির বর্ণনা আছে। প্রথম চারটি

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতি আহ্বাণের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন মতানৈক্য নেই। তবে মহাযানদের চতুর্থ সংগীতি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে সংক্ষেপে বৌদ্ধ সংগীতির বর্ণনা ও আহবানের কারণসমূহ পর্যালোচনা করা হলো:

প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি

জগতজ্যোতি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে, রাজগৃহের বৈভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়[১৬] ৫০০ অর্হৎ স্থবিরের অংশগ্রহণে দীর্ঘ সাত মাস সময়ব্যাপী প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি ৫৪৫ খ্রিষ্টপূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। একে ধর্ম-বিনয় সংগীতি কাশ্যপ সংগীতি, পঞ্চশতিকাসঙ্গীতিও বলা হয়।[১৭]

এ সংগীতি আহ্বাণের মূল কারণ হলো-বয়োবৃদ্ধ দুর্বিনয়ী ভিক্ষু সুভদ্রের বিনয় বিরুদ্ধ অসৌজন্যমূলক উক্তি করার ফলে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, উপালি প্রমুখ বিনয়ী ও ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুসংঘ ধর্ম-বিনয় সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। সর্ব সম্মতি ক্রমে সংগীতিতে মহাকাশ্যপ সভাপতি ও প্রশ্নকর্তা, বিনয়ধর উপালি বিনয় আবৃত্তি এবং স্মৃতিধর আনন্দ ধর্ম (সূত্র) আবৃত্তি করেন। (ধম্মং চ বিনয়ং চ সংগহীতো, চুল্লবগ্গ, একাদশ পরিচ্ছেদো) পালি, সংস্কৃত, চীনা, তিব্বতি প্রভৃতি ভাষা সাহিত্য প্রথম সংগীতির বিবরণ আছে প্রথম সংগীতি কার্যসমূহ তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিলো- (১) ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি (উপালি স্থবির বিনয় এবং আনন্দ স্থবির ধর্ম আবৃত্তি করেন), (২) আনন্দ ও ছন্দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিচার, (৩) ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ কোনগুলো নির্ধারণ করা।

প্রথম সংগীতিতে ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় প্রথমে সংগৃহীত হয় কারণ বিনয় ছিলো বুদ্ধশাসনের আয়ু স্বরূপ। থেরবাদী বৌদ্ধগণ মনে করেন অভিধর্ম ধর্ম অর্থাৎ, সূত্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো। প্রথম সংগীতি সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিলো চার মাস।

দ্বিতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বৎসর পর মগধরাজা কালাশোকের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অর্হৎ যশ স্থবিরের অনুপ্রেরণা রেবত স্থবীরের সভাপতিত্বে বৈশালীর

Dhaka University Institutional Repository

বালুকারামের ৭০০ অর্হৎ স্থবিরের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আট মাস সময় দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। একে বিনয়সংগীতি বা সপ্তসতিকা বৌদ্ধ মহাসংগীতিও বলা হয়। দ্বিতীয় সংগীতিতে ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কার্যকলাপ আলোচনা ও নির্ধারণে প্রশ্নকর্তা ছিলেন রেবত স্থবির এবং উত্তর দাতা ছিলেন সর্বকামী স্থবির। মূলধারার চারজন-রেবত, সম্ভূত, সানবাসী ও যশ। এবং নতুন ধারার চারজন-সব্বকামী, সালহ, খুজ্জসোভিত ও বসভকে নিয়ে কার্যকারক সভা গঠন করা হয়।[১৮]

এ সংগীতি আয়োজনের অন্যতম বিষয় হলো 'দশবত্থুনি'। এতে উভয় পক্ষ থেকে চারজন করে মোট আটজন সদস্যকে নিয়ে কার্য কারক সভা গঠিত হয়। কার্যকারক কমিটি 'দশবত্থুনীকে বিনয় বহির্ভূত বলে ঘোষণা করেন। এ সংগীতি হতে দশ হাজার বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুকে বহিস্কার করা হয়। এর ফলে বৌদ্ধ সংঘে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদেরই অধর্মবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং এর ফলে বিভক্ত হয় থেরবাদী ও মহাসাংঘিক[১৯] সম্প্রদায়ে। প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক দশবস্তু হলো-কপ্পতি সিঙ্গিলোন কপ্পো, দ্বংগুল কপ্পো, গামন্তর কপ্পো, আবাস কপ্পো, অনুমতি কপ্পো, অচিন্ন কপ্পো, অমথিত কপ্পো, জলোগি কপ্পো অদসকং নিসীদনং, জাতরূপরজত।[২০] তিব্বতি ও চীনা বিবরণ মতে, দার্শনিক প্রবর মহাদেব প্রচারিত পাঁচটি মতবাদ হলো :

ক) অর্হৎ অজ্ঞাতসারে পাপ করতে পারেন;

খ) তিনি স্বয়ং যে অর্হৎ তা তিনি নাও জানতে পারেন;

গ) কোন মতবাদ সম্পর্কে অর্হৎ এর সন্দেহ থাকতে পারে;

ঘ) গুরু ব্যতীত কেহ অর্হৎ হতে পারে না;

ঙ) ধ্যানস্থ অবস্থায় হটাৎ হা কষ্ট! হা কষ্ট! এইরূপ বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণের দ্বারা সত্য উপলব্ধি করতে পারা যায়।

প্রথমত: দ্বিতীয় সংগীতিতে পুনরায় ধর্ম-বিনয়ের সঙ্গায়ন হয়। এ সংগীতি আহ্বাণের কারণ হলো: বৈশালীর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয় দশবত্থুনি বা দশবিধ আচরণ বুদ্ধ শাসনে প্রবর্তন

Dhaka University Institutional Repository

করলে ভিক্ষুদের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। এ দশবত্থুনি বিনয় বিধাণ সংগত কিনা তা নির্ণয় করণ এবং নিরশনকরণ।

দ্বিতীয়ত: বুদ্ধের সূক্ষানুসূক্ষ শিক্ষাপদ বা ধর্ম-বিনয় সমূহ পালন এবং লংঘন বা ব্যতিক্রমের ঔচিত্যানোচিত্য বিচার করে যথার্থ বুদ্ধ বচন রক্ষা করা অর্থাৎ, অধর্ম প্রকোপ হতে ধর্মকে রক্ষা করা। এতে যাচাই পূর্বক বজ্জীদের দশবত্থুনী বিনয় বহির্ভূত ঘোষণা করার ফলে এ সংগীতিতে বৌদ্ধধর্ম প্রধান দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ও পালি সাহিত্যের ইতিহাসে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ২১৮ বৎসর পর সম্রাট অশোকের সহযোগিতায় মোগ্গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত এক সহস্র ত্রিপিটকজ্ঞ ভিক্ষুকে নিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস ধরে পাটলিপুত্রে যে সংগীতি হয় তাই তৃতীয় সংগীতি। অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসর পর পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ বা ২৫৩ অব্দে তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন হয়েছিলো।[২১] একে সহস্রিকা সঙ্গীতি বলা হয়।

মোগ্গলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে সকল ভিক্ষুসংঘকে একত্রিত করে পর্দার অন্তরালে এক একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধ কোনবাদী? কেবল ধর্মবাদী ভিক্ষুরাই উত্তর দিলেন 'বুদ্ধ বিভজ্জবাদী'। (মহাবংস, পঞ্চমো ভাণবারো) পরবর্তীতে অধর্মবাদীদের শ্বেতবস্ত্র পরিয়ে বুদ্ধশাসন থেকে তাঁদেরকে বহিষ্কার করা হয়। এ অধর্মবাদীর সংখ্যা ছিলো ৬০ হাজার।

সম্রাট অশোকের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দর্শনের ভাবান্তর অশোক মনের হিত সাধনে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুই শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ঘোর দুর্দিন। এতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও ধর্ম শাস্ত্রের প্রচলন শুরু হয়। ফলে যথার্থ ধর্মের প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটায় এবং প্রকৃত বুদ্ধ বচন স্থির করা সম্ভব পর ছিলো না বলে সংঘে অত্যন্ত বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। একই বিহারে বৌদ্ধভিক্ষু ও তীর্থিকের সহবাসে ঘোরতর

Dhaka University Institutional Repository

সংকটে সংঘকর্ম বা উপোসথ কর্ম প্রচলন করা এবং ধর্ম-বিনয় তথা ত্রিপিটক সংকলন করার জন্য তৃতীয় সংগীতি আহ্বান করা হয়।

পণ্ডিত নলিনাক্ষ দত্ত এবং চীনা, তিব্বতি উপাদান মতে একই বিহারে থেরবাদী ও মহাসাংঘিক দুই পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিমোক্ষ উপোসথ পালন সম্ভব ছিলো না, উক্ত মত বিরোদের কারণেই তৃতীয় সংগীতি আহূত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতিতে বুদ্ধবাণী 'ধর্ম বিনয়' নামে অভিহিত। এ সংগীতিতে মোগ্গলিপুত্ত স্থবির 'কথাবত্থু' নামক গ্রন্থ রচনা করে তা অভিধর্ম পিটকে সংযোগ করে সর্ব প্রথম বুদ্ধ বচনকে সূত্র, বিনয়, অভিধর্ম সমন্বয়ে ত্রিপিটক রূপে আখ্যায়িত করা হয়। অন্যান্য সংগীতির ন্যায় তৃতীয় সংগীতির কার্য সমাপ্তি কালে সদ্ধর্মের পুনপ্রতিষ্ঠার হিত কার্যে সসাগরা পৃথিবী প্রকম্পিত হয়েছিলো। এ সংগীতি উত্তর কালে নয়টি স্থানে ধর্ম প্রচারক দল প্রেরণ করা হয়। ধর্মদূতদের নাম: মধ্যন্তিক-কাশ্মীর ও গান্ধার, মহারক্ষিত- যোনক (সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি গ্রীক দেশসমূহ), মধ্যম-হিমবন্ত প্রদেশ (হিমালয়ের পার্বত্য দেশসমূহ ও নেপাল, চীন), ধর্মরক্ষিত- অপরান্ত (প্রত্যন্ত রাজ্যসমূহ,) মহাধর্মরক্ষিত- মহারাষ্ট্র, মহাদেব-মহিসমন্ডল অর্থাৎ, মহীশূর, রক্ষিত-বনবাসী, রাজপুতানা (উত্তর কাশাড়া), সোন ও উত্তর- সুবর্ণভূমি বার্মা (মায়ানমার) এবং মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা- সিংহল, তাম্রপর্ণী (শ্রীলংকা)।[২২]

থেরবাদী আদর্শে চতুর্থ সংগীতি সিংহলে অনুষ্ঠিতটি থেরবাদীদের মতে চতুর্থ সংগীতি। স্মৃতিভ্রষ্ট হতে পারে এ চিন্তা করে সিংহলি ভিক্ষুরা লঙ্কা দ্বীপের অনুরাধাপুরের থুপারাম বিহারে সম্মিলিতি হয়ে মহিন্দ থের কর্তৃক ধারণকৃত ত্রিপিটক সংকলিত ত্রিপিটক সিংহলরাজ দেবনামপ্রিয় তিষ্যের তত্ত্বাবধানে প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়।[২৩] এ সংগীতিতে মহেন্দ্র স্থবিরের নেতৃত্বে প্রধান আবৃত্তিকার মহা অরিষ্ট স্থবির পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক অবিকল আবৃত্তি করেন। এ সময় ষাট হাজার স্মৃতিধর স্থবির ত্রিপিটক আবৃত্তি করেন।[২৪] এ সংগীতিতে ত্রিপিটক তালপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটাই বর্তমান পালি ত্রিপিটক নামে অভিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য

চতুর্থ সংগীতি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত। পণ্ডিত মহলে এ সংগীতি বিষয়ে মতানৈক রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধ মতে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাটলিপুত্রের অশোকারাম বিহারে যে সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় তা সর্বজনীন ছিলো না। এতে কেবলমাত্র থেরবাদী সংঘমনীষীরা অংশগ্রহণ করেন; মহাযানী বা সর্বাস্তিবাদী কোন ভিক্ষু এতে আহুত হননি। অপর পক্ষে কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্ব কালে খ্রিস্টপূর্ব ৭৮-১০১ অব্দে পুরুষপুর বা জলন্ধরে কাশ্মীরের কুন্তলবন বিহারে যে সংগীতি অনুষ্ঠিত হয় এতেও থেরবাদী কান ভিক্ষু যোগদান করেননি। আধুনিক পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদদের মতে: এটি চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতি। তবে থেরবাদী বৌদ্ধগণ ইহা স্বীকার করেন না।[২৫] ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ইহাকে কণিষ্ক সংগীতি বলে চিহ্নিত করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণিতে ধর্মপ্রাণ সম্রাট কণিষ্ক রাজগুরু পণ্ডিত পার্শ্বের পরামর্শে তিনি এ সংগীত আহ্বাণ ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাই এটি কণিষ্ক সংগীতি বা সর্বাস্তিবাদী সংগীতি নামেও পরিচিত।

ইতিহাসে জানা যায় যে, চতুর্থ সংগীতি একটি বহু আলোচিত বৌদ্ধ সংগীতি। মহান সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের ধর্ম দর্শন ও শিক্ষা এবং বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ে জানার জন্য পণ্ডিত ভিক্ষুদের আহ্বান করেন। এতে তিনি দেখেন বুদ্ধের ধর্মদর্শন ও শিক্ষাপদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করছে। প্রকৃত ধর্মবাণী নির্ধারণের জন্য তৎকালের খ্যাতিমান পণ্ডিত পার্শ্বকে সভা আহ্বানের দায়িত্ব দেন। তখন এ সভা আহ্বান করার জন্য কাশ্মীরে সম্রাট কণিষ্ক এর পৃষ্টপোষকতায় কুন্তল বন বিহার নির্মাণ করা হয়। এ সংগীতি সভায় শুধু ত্রিপিটক সাহিত্য নয়, অর্থকথা সাহিত্যও সংকলন করা হয়। এ সভা পালি ভাষার পরিবর্তে সকল সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা হয়। রচনা করা হয় ঐতিহাসিক বিভাসা শাস্ত্র। এ ভাষা সাহিত্য সম্রাট কণিষ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল এবং পশ্চিম এশিয়াসহ কাবুলে প্রসার লাভ করে। এছাড়া গান্ধার, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম ভারত, সমতলীয় উচ্চ গাঙ্গের জুম্ন এবং বারাণসী, লাদাখ ও কাশ্মীর।[২৬]

ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তাঁর Political History of ancient India গ্রন্থ মতে, বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতভেদ দূর করা, বুদ্ধের প্রবর্তিত মতবাদের একটি সূচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

এবং বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থাদির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে এগুলোর উপর ভাষ্য বা টীকা রচনা করা ছিলো এ সম্মেলনের লক্ষ্য। এর বিশেষত্ব হলো এতে ব্যবহৃত ভাষা পালি ছিলো না। প্রথম সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকে অট্ঠকথা সংগৃহীত হয়। এই সংগীতিতে যে সমস্ত অট্ঠকথা সংগৃহীত হয়, তা 'বিভাসা শাস্ত্র' নামে অভিহিত। বিভাসা শাস্ত্র তিন ভাবে বিভক্ত- (১) উপদেশ বিভাসা শাস্ত্র (২) বিনয় বিভাসা শাস্ত্র ও (৩) অভিধর্ম বিভাসা শাস্ত্র।[২৭] হিউয়েন সাঙের মতে, প্রত্যেকটি বিভাসা শাস্ত্রে ১,০০,০০০ শ্লোক আছে। তিনটিতে সর্বমোট ৩ লক্ষ শ্লোক আছে। সংস্কৃত ভাষা সংকলিত তিনটি বৌদ্ধশাস্ত্র মহাযান সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক গ্রন্থের অন্তর্গত।[২৮] এ সংগীতিতে সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত বসুবন্ধু, বসুমিত্র, নাগার্জুন, পার্শ্ব, সংঘরক্ষ, মহাকবি অশ্বঘোষ সহ বহু পণ্ডিত ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। এতে মহাপণ্ডিত বসুমিত্র সভাপতি এবং মহাকবি অশ্বঘোষ সহ-সভাপতিত্ব করেন। সংগীতিকারক হিসেবে পাঁচশত প্রাজ্ঞ ভিক্ষুসংঘমনীষা উপস্থিত ছিলেন। সম্রাট কণিষ্ক সংগীতি শেষে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য নেপাল, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলীয়া, তুর্কীস্থান ও গান্ধার প্রভৃতি দেশে ধর্ম প্রচারক প্রেরণ করেছিলেন। ইতিহাস মতে, বৌদ্ধধর্মে মহাযান শাখার উৎপত্তি এই সংগীতি থেকে শুরু হয়।[২৯] সংগীতি সমাপ্তির পর সম্রাট কণিষ্কের আদেশে সমস্ত বিভাসা শাস্ত্র (Vibhasa Sastra) তাম্রফলকে খোদাই করা হয় এবং পাথরের বাক্সে তালাবদ্ধ করে এর উপর বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করা হয়।[৩০] পণ্ডিত, সাহিত্যিকগণ ও অনেকে একে এ মহান শাস্ত্রকে বিভাসা শাস্ত্র বলে অভিহিত করেছেন।

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায়, মৌর্যশাসন কালে আর্য কত্যায়নীপুত্র সংস্কৃতে 'জ্ঞানপ্রস্থান' নামে সর্বাস্তিবাদের উপর যে গ্রন্থ রচনা করেন, কনিষ্কের সময়ে সেই গ্রন্থের উপর 'বিভাষা' নামে এক বিশালাকার ভাষ্য রচিত হয়। চতুর্থ সংগীতিতে আচার্য বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষের অবদান এক্ষেত্রে স্মরণীয়। 'বিভাষা'র তিনটি টীকার মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা বড় টীকাটি 'মহাবিভাষা' নামে পরিচিত। এই মহাবিভাষা তিনবার চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। কাশ্মীরের বৈভাষিক সংঘভেদ (৩৮৩ খ্রি.) মহাবিভাষার প্রথম অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় অনুবাদ করেন বুদ্ধবর্মা (৪২৪ খ্রি.)। এঁর কৃতী কালের গহ্বরে লুপ্ত। এরপর সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ দীর্ঘ চার বছরেরর পরিশ্রমে (৬৫৬-৬৫৯খ্রি.) মহাবিভাষার অনুবাদ কার্য সম্পন্ন করে নিজের যশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই

Dhaka University Institutional Repository

'মহাবিভাষা' শাস্ত্রগ্রন্থটি বৌদ্ধদর্শনের এক বিরাট জ্ঞানকোষ বললে অত্যুক্তি হয় না। বৈভাষিকদের এটি অন্যতম গ্রন্থ বিশেষ।[৩১]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, সংগীতির সত্যতা নিয়ে পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগন মতান্তর ও সন্দেহ প্রকাশ করলেও সংগীতি যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে চিরসত্য। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ধর্ম-বিনয় (ত্রিপিটক) সংরক্ষণের জন্য সংগীতি আহবান করা হয়েছিলো এবং এর ভূমিকা ছিলো অপরিসীম। মোটকথা বিনয় সংরক্ষণ এবং বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনে এই সংগীতিসমূহ এক সুদূর প্রসারী ইতিহাস গড়ে তুলেছিল।

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ এবং পালি ভাষার প্রসারের সঙ্গে জাতকের সম্পর্ক নিরবিছিন্ন। জাতক'কে বৌদ্ধ পালিসাহিত্যের গরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে বুদ্ধদের যে সকল লোক-কল্যাণকরের জন্য মহৎ কর্ম করেছিলেন 'জাকত' সেগুলোরই কাহিনি।

'জাতক' শব্দটি 'জাত' হতে উদ্ভূত হয়েছে। 'জাত' শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভূত, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং জাতক শব্দের অর্থ হলো যিনি উৎপন্ন বা জন্মলাভ করেছে। পালি সাহিত্যে কেবলমাত্র গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্ত বেঝাতেই 'জাতক' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩২] জাতকে মূলত গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জীবনকাহিনিই প্রকাশিত হয়েছে। এজন্যে জাতককে বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে জাতকের উৎস বুদ্ধের পূর্ব জীবনকাহিনি। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় ও পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বজন্মের কাহিনিসমূহ স্বীয় স্মৃতিতে পুনর্জাগরণ সম্ভব হয়, এটি সত্যসত্যই একটি চিন্তনীয় বিষয়। সাধরণ দৃষ্টিতে এটি নিতান্তই আধ্যাত্মিক বিষয় মনে হলেও, বৌদ্ধ দর্শন মতে এটি সম্যক প্রচেষ্টারই ফল। এ দর্শন মতে কারো বরে বা কারো আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে বুদ্ধ হওয়া যায় না। জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূরণের দ্বারা জীবনধারাকে ক্রমোন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হয়, পারমীর চূড়ান্ত পূর্ণতা সাধানের মাধ্যমেই বুদ্ধত্ব লাভ হয়। পামরী দশটি। প্রত্যেকটিকে তিন পর্যায়ে সাধন করতে হয়। এরূপে সর্বমোট পামরী হয় ত্রিশটি। পারমীর এই ত্রিশটি ধারা

Dhaka University Institutional Repository

পূরণকারীর চৈতন্যে উচ্চ মার্গের এক জ্ঞানপ্রবাহরে উদ্ভব ঘটে। এই জ্ঞানকে বলা হয় 'জাতিস্মর' জ্ঞান। শাস্ত্রমতে জাতিস্মর জ্ঞানের প্রভাবে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জ্ঞাতব্য হয়।

গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব[৩৩] জীবনে পারমী পূর্ণতার সাধনা করেছিলেন। এ বোধিসত্ত্ব জীবন জন্ম-জন্মান্তরের কর্মপ্রবাহে পরিগ্রহ হয়। তাঁর সাধনচর্যার শেষ পর্যায়ে তিনি রাজপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনে গৃহত্যাগপূর্বক ছয় বছর কঠোর চিত্তবিশুদ্ধি সাধনা দ্বারা পামরীর পূর্ণতা অর্জন শেষে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এ সময় তাঁর পরম জাতিস্মর জ্ঞান লাভ হয়। এ জ্ঞানপ্রভাবে যে-কোনো বিষয়ে চিত্ত নিবেশন করলে তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব হয়। গৌতমবুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব লাভোত্তর জীবনে জাতিস্মর জ্ঞানের মাধ্যমে অনুধ্যান করে অতীত জীবনের কাহিনিগুলো তাঁর শিষ্যদের কাছে ধর্মোপদেশের ছলে বিবৃত করতেন। গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বকালীন পারমী সাধনার বিবিধ প্রকারের কাহিনিই জাতকের উৎস। অর্থাৎ, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব-পূর্ব জীবনকাহিনিই জাতক। পূর্ব জীবন বলতে এখানে অসংখ্য পূর্ব জীবনকে বোঝানো হয়। তবে বৌদ্ধ সাহিত্যে[৩৪] বুদ্ধের ৫৫০ পূর্ব জন্মের কাহিনির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলোতে বোধিসত্ত্ব রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র-চণ্ডাল থেকে হাতি, ময়ূর, রাজহাঁস ইত্যাদি বিবিধ তির্যক প্রাণীতেও জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেককে স্বকৃত কর্মের প্রভাব অবগত করা এবং জীবন বাস্তবতায় নৈতিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করণে সহায়তা করা ও এতোদ্দেশ্যে পারমিতাসমূহের গুণবৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা। বোধিসত্ত্ব কোনো জন্মে দান, কোনো জন্মে শীল, কোনো জন্মে প্রজ্ঞা, কোনো জন্মে সত্য, কোনো জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং সে সঞ্চিত পুণ্যবলে অভিসম্বুদ্ধ হয়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুক; তা হলে তাঁরাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করে শেষে নির্বাণ লাভ করবেন; সহজ কথায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতকের নায়ক বোধিসত্ত্ব, নায়িকা ও অনুষঙ্গী চরিত্রগুলো স্থান-কাল-পাত্র ভেদে উপস্থিত হয়। বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জাতকের সাথে সম্পৃক্ত। কখনোও কেন্দ্রীয় চরিত্রে, কখনোও বা সহযোগী চরিত্রে, আবার কখনোও দেখা যায় কাহিনি উপসংহার বা সমাধান টানার জন্য একজন প্রাজ্ঞ,

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিতচরিত্রেও বোধিসত্ত্বের উপস্থিতি ঘটে, এবং ক্ষণকালের জন্য উদ্ভব এই চরিত্রের ওপর সমগ্র কাহিনির নির্ভরতা চলে আসে। যেমন অভীক্ষ্ম জাতক (২৭নং) দুরাজাত জাতক (৬৪ নং)। আবার কিছু জাতকে বোধিসত্ত্ব কাহিনির একজন প্রত্যক্ষ দর্শক। তাঁর সামনেই ঘটনা পরম্পরাক্রমে নাটকের মতো যেন মঞ্চস্থ হচ্ছে। এক্ষেত্রেও দেখা যায় ঘটনার বাইরে থেকেও মূল ঘটনার মধ্যে বোধিসত্ত্বের পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। যেমন পুষ্পরক্ত জাতক (১৪৭ নং), সঞ্জীব জাতক (১৫০নং) ইত্যাদি। এখানে বোধিসত্ত্ব ছায়া নায়ক বা পরোক্ষ নায়ক হলেও, কাহিণিতে বিরাজিত নায়ক চরিত্রটি পূর্ণতা পায় এই পরোক্ষ নায়ক বোধিসত্ত্বের উপস্থিতি ও প্রত্যক্ষকৃত্যের কারণে।[৩৫] সুতরাং এভাবে বোধিসত্ত্বের প্রাধান্য সংরক্ষিত থাকে প্রতিটি জাতকে।

জাতক কাহিনিতে নায়িকা চরিত্রটি অপরিহার্য নয়। নায়কই মুখ্য। নায়ককে কেন্দ্র করেই কাহিনি বিস্তার লাভ করে, নায়ক বাস্তব সত্য প্রতিষ্ঠা ও জীবনের অন্তিম পরিণতিতে নিরঙ্কুশ অনাবিল শান্তি লাভের প্রত্যয়ে তার পথ পরিক্রমা রচনা করেন। এতে অনুক্রমিকভাবে নানা ঘটনা ও চরিত্রের উদ্ভব ঘটে। অন্যান্য চরিত্রের অনুরূপই এখানে নায়িকা চরিত্র কাহিনির প্রয়োজনে সংযোজিত হয়।

জাতকের নায়ক যেহেতু বোধিসত্ত্ব, তিনি স্বভাবতই অনিত্য ও অনাত্মা দর্শনের অনুসরণকারী, জীবন-জগতের অবশ্যম্ভাবী দুঃখের হেতু উদ্‌ঘাটনে দৃঢ় প্রত্যয়ী, সর্বোপরি বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশায় পারমী ধর্মের অনুশীলনে ব্রতী হন।

তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি সমাপন উত্তর সম্রাট অশোক ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ও তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে ধর্মদূত প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। ভিক্ষুসংঘের জ্যেষ্ঠ স্থানীয় মোগ্‌গলিপুত্ত থেরকে সম্রাট অশোক অনুরোধ জানালেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। এ সময়ে তিনি নয় স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করেন। ধর্মদূতগণের মাধ্যমে ত্রিপিটক ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী বহু দেশে পৌঁছায়। জাতক যেহেতু ত্রিপিটকের অংশ, সুতরাং ত্রিপিটকের সাথে জাতক ক্রমে দেশ-দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়।

বৌদ্ধ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ শাসনবংশ মতে সম্রাট অশোক নয় স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। যে নয় স্থানে প্রথম ধর্মীয় বার্তাবাহীদল পাঠানো হয়েছিলো যেগুলো হলো-মহিন্দ থের'র[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্বে সিংহলদ্বীপে (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), সোন থের ও উত্তর থের'র নেতৃত্বে সুবন্নভূমিতে,[৩৭] মহারক্ষিত থের'র নেতৃত্ব যোনক রাজ্যে, [৩৮] যোনক রক্ষিত থের'র মাধ্যমে বনবাসী রাজ্যে,[৩৯] ধর্মরক্ষিত থেরকে অপরান্ত রাজ্যে,[৪০] মজ্ঝন্তিক থেরকে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যে,[৪১] মহারেবত থেরকে মহিংসক মণ্ডলে,[৪২] মহাধর্মরক্ষিত থেরকে মহারাষ্ট্রে,[৪৩] এবং মজ্ঝিম থেরকে হিমবন্ত ও চীন সাম্রাজ্যে।[৪৪]

এভাবে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সাথে জাতকও প্রাচ্য মধ্যপ্রাচ্য হয়ে ক্রমে প্রতীচ্যে গিয়ে পৌঁছে। এর ফলে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিদ পণ্ডিতদের কাছে বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।[৪৫]

একটি পূর্ণাঙ্গ 'জাতক' তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

- প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা;
- অতীতবস্তু গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত বোধিসত্ত্বের অতীত কাহিনি);

এবং * সমাধান (অতীত বস্তুর সাথে বর্তমান বস্তুর যোগ নির্ণয়)।

এগুলো ছাড়াও 'গাথা' ও বেজ্জকরণ নামে আর দুটি ভাগ আছে। জাতকের পদ্যাংশের নামই 'গাথা এবং গাথার ব্যাখ্যা অংশের নাম 'বেজ্জকরণ',। অতীত বস্তুই মূলত: জাতকের মূলাংশ। সেদিক থেকে জাতকের মূলাংশ হিসেবে যেমন অতীত বস্তুই চিহ্নিত তেমনি জাতককে প্রাচীন ভারতীয় কথাসাহিত্যের অনর্ঘ রত্নকোষ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। 'জাতক' কেবলমাত্র পালি সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি প্রাচীনতম গ্রন্থ রামায়ণ মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র এবং হিতোপদেশের কাহিনির মধ্যেও বিদ্যমান। জাতকের মূল লক্ষ্য হলো অহিংসা, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং শীল-শীলাদির ব্যাখ্যা ও প্রচার। এই অহিংসা, ত্যাগ ইত্যাদি শুধু মানুষের প্রতি মানুষেরই নয় পশুর উপরও দেখা যায়।

ইতিহাস এবং ঐতিহাসিকতার দিক থেকেও জাতকের মূল্য অসাধারণ। কেননা অধিকাংশ জাতকের কাহিনি শুরু হয়েছে "অতীতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মদত্তো রজ্জং করেসি। এই বাক্য দিয়ে। এখানে ব্রহ্মদত্ত ঐতিহাসিক না কাল্পনিক তা গবেষনার বিষয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক রাজন্যবর্গের নাম এখানে উল্লেখিত। যেমন- প্রসেনদি (প্রসেনজিৎ), উদেন (উদয়ন) ইত্যাদি

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক নাম। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি জাতক কেবলমাত্র পালিসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এটি হিন্দু ধর্মের প্রাচীনতম গ্রন্থ রামায়ন, মহাভারত, হরিবংশ এবং পুরাণের অধিকাংশ কাহিনিতেও স্থান করে নিয়েছে। এ সকল গ্রন্থর কাহিনির বর্ণনায় দেখা যায় কোথাও কাহিনিগুলো অল্প বিকৃত কোথাও আবার অবিকৃত। নিম্নে জাতকের মধ্যে রামায়ন মহাভারত এবং পুরাণের কাহিনির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

(i) জাতকে রামায়নের কাহিনি : 'রামায়ন' হিন্দুধর্মের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এই গ্রন্থের আলোচনার পূর্বে আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের মতো বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে বাংলা সাহিত্যেও। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিলো এবং এরই মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধির উন্নতি ঘটে। 'অলম্বুসা' জাতকে পাওয়া যায় ঋষ্যশৃমুনির উপাখ্যান। এ কাহিনি আবার বাল্মীকি রামায়ণে নেই কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বিদ্যমান। অন্যদিকে, 'দশরথ জাতকে' রামের বনবাস সহ রামায়নের প্রভৃতি কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই জাতকে রামচন্দ্রকে দেখা যায় রামপণ্ডিত এবং পিতা দশরথকে দেখা যায় বারাণসীর রাজা চরিত্রে। রাজা দশরথের তিনজন মহিষী ছিলেন। রাজার কর্তব্য পরায়ন ও ধার্মিক পুত্র রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে গমন করেন। সাথে ছিলেন পতিব্রতা সীতা ও অনুজ লক্ষণ। বনবাস কালে রাজা দশরথের মৃত্যু হলে অনুজ ভরত কর্তৃক তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে গমন পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে সীতা ও লক্ষণ মূর্ছা গেলেও রামচন্দ্র ধৈর্যহারা না হতে সংসারের অনিত্যতার ব্যাখ্যা করলেন এবং পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বনবাস করবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলেন। ভারতকুমার রামের পাদুকাকে প্রতিনিধি করে রাজ্য পালনে মনোনিবেশ করলেন। এদিকে বনবাস কালে লংকার রাজা রাবন কর্তৃক সীতাহরণ, অবশেষে সীতা উদ্ধারে রাম-রাবনের যুদ্ধ বানর প্রধান হনুমান দ্বারা রামকে সাহায্যদান, সতীত্ব প্রমাণের জন্য সীতার অগ্নিপরীক্ষা এবং রাম কর্তৃক রাজ্যশাসন পরিচালনা ইত্যাদি এ কাব্যের বিষয়বস্তু। সীতা রামের সহোদরা ভগ্নী ও পত্নী- এ তথ্য সবৈব নতুন। সংসারে অনিত্যতা সম্পর্কে রামপন্ডিতের ভাষণটিও বৌদ্ধ আদর্শের প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

(ii) জাতকে মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনি

মহাভারত ও হরিবংশের কাহিনিও পরিবর্তিত আকারে জাতকে পাওয়া যায়। 'কন্হদীপায়ন' জাতকে আছে মহাভারতোক্ত অণিমান্ডব্যের কাহিনি। দ্বৈপায়নের কৃষ্ণবর্ণ হবার উপাখ্যানে নূতনত্ব আছে। শূলারোপিত মান্ডব্যের রক্ত দোহ ধারণ করতেই দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন আখ্যা লাভ করেছিলেন। বিদুরের প্রসঙ্গ আছে 'দসব্রাহ্মণ' জাতকে। শিবি মহারাজের ব্রাহ্মণকে চক্ষুরত্ন দানের কাহিনি 'শিবি' জাতকে বর্ণিত হয়েছে। শিবিগ্রোত্রজ আর এক রাজার অত্যাশ্চর্য সংযমব্রতের কাহিনি রয়েছে 'উম্মদন্তী' জাতকে। দুষ্মন্ত শকুন্তলা উপাখ্যানের ছায়া দেখা যায় 'কট্ঠহারি' জাতকে।

(iii) জাতকে পুরাণ-কাহিনি :

পুরাণেরও বহু কাহিনি বৌদ্ধজাতকে পাওয়া যায়। তবে কাহিনিগত অনৈক্যও আছে। 'ভিস' জাতকের শত্রুকর্তৃক মৃণাল অপহরনের কাহিনি আছে মহাভারতে পদ্মপুরাণে (সৃষ্টি খন্ড)। পদ্মপুরাণের কাহিনির সাথে জাতক কাহিনির মিল বেশি। উভয়মহলেই 'অপ্রতিগ্রহ' ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

'সীলবীমংসন' জাতকে সাংখ্যসূত্রোক্ত দুটি কাহিনির প্রসঙ্গ আছে। বৌদ্ধজাতকে বাসনাত্যাগের দৃষ্টান্তরূপে কাহিনি দুটির ইষৎ বিস্তার করা হয়েছে। এক শ্যেন মাংসখন্ড চুরি করায় শকুনদল তাকে উৎপীড়িত করে, মাংসখন্ড ত্যাগ করে শ্যেন নিস্তার লাভ করে। সংসারে বাসনাৎ মাংসকন্ডবৎ, তার ত্যাগেই সুখ। পিঙ্গলার কাহিনিও অনেকটা এইরূপ। পিঙ্গলানাম্মী এক দাসী একজন পুরুষকে সংকেত করে সরারাত আশা করে বসেছিলেন; শেষরাত্রে 'মানুষটি আর আসবে না'- এই ভেবে সে সুখে নিদ্রা গেল। আসক্তিতে নিরাশ হতে পারলেই সুখ। পিঙ্গলার এই কাহিনি আরও বর্ণাঢ্য রেখায় চিত্রিত হয়েছে ভাগবত পুরাণের একাদশ স্বকন্ধে।[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

এই জাতকের প্রভাব এবং পদচারণা শুধু বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয় আধুনিক সাহিত্যেও লক্ষণীয়।

মানুষের জীবনের ইতিবৃত্ত নিয়েই সাহিত্য। সাহিত্যে মানুষের জীবন-জীবিকাসহ সমাজাচার এবং উন্নয়ন ও প্রগতির কৌশলও অন্তর্ভূক্ত। প্রেম, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস ছাড়াও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত সবকিছুই আধুনিক সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ সমাজ, রাজনীতি ও দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার বাস্তব চিত্রই আজ সাহিত্যের বিষয়। পুরানে বাংলা সাহিত্যের মূল উপাদান ছিলো 'ধর্ম'। এ বিষয়ে সুকুমার সেন বলেন :

"পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল-অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়ে ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আন্বীক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধিভৌতিক কার্যকারণের উপর আস্থাবান হইল-তখনই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাহার অহেতুক কৌতূহলের উদয় হইল। তদানুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিও নতুন রূপ পাইল, নভেলে। দেবদেবী, যক্ষরক্ষ, রাজারাণী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের অনুজ্জল কাহিনিতে উৎসাহ জাগিল"।[৪৭]

এভাবে সাহিত্যে অতিমানব ও দেবদেবীদের স্থানে উঠে এলো সাধারণ লোক। রবীন্দ্রনাথের মতে-

"আমরা রসসম্ভোগের সত্যযুগ হইতে তর্কবিতর্কের যুগান্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলাম।"[৪৮] সাহিত্য উপজীব্যের এই যুগান্তরে সহজ ব্যাপার নয়। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন: "সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত।"[৪৯] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ে বিরাজমান বাংলা সাহিত্যে গতি অঙ্কন করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের গদ্যরীতিকে একটি অবস্থানে পৌঁছে দিলেন। তাঁর এই সাহিত্যশিল্প পাঠকের হৃদয়কে আকর্ষণ করতে সমর্থ হলো। বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা রূপে তাঁর আসন পাঠকের হৃদযে সুপ্রষ্ঠিত হলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করলেন।"[৫০]

বঙ্কিমের রচনার প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় মেলে। তবে তিনি গোঁড়া ধার্মিক নন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় তাঁর চিত্তপ্রকৃতি গঠিত। প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মধর্মের বিপক্ষে আর বৈজ্ঞানিক নব হিন্দু ধর্মের সপক্ষে ছিল তাঁর অবস্থান।[৫১] তিনি ধর্মের গূঢ়তত্ত্বকে সাহিত্যের মাধ্যমে সরলভাবে উপস্থাপনায় প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি উচ্চারণ করলেন: "সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে।"[৫২] সেই ধর্মের স্বরূপও তিনি উল্লেক করেছেন। তাঁর মতে :

"ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, এবং হৃদয়ে শান্তি, ইহাই ধর্ম। ভক্তি, প্রীতি, শান্তি, এই তিনটি শব্দে যে বস্তু বিচিত্র হইল, তাহার মোহিনী মূর্তির অপেক্ষা মনোহর জগতে আর কি আছ? তাহা ত্যাগ করিয়া আর কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে?"[৫৩]

অর্থাৎ, তাঁর দৃষ্টিতে জীবনাচারের নৈতিক গুণসমূহই ধর্ম। জগতের সকল আধ্যাত্মিক ধর্মেও এইগুণোৎকর্ষ প্রতিভাত হয়েছে। বৌদ্ধ জাতক সাহিত্যে এ বিষয়সমূহ বহুপূর্ব হতেই স্থান পেয়েছে। বৌদ্ধ জাতকও হলো এরূপ নীতি-আদর্শ প্রকাশক সাহিত্য। এটি বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটকের একটি ক্ষুদ্র অংশ। এ জাতকের উৎস ও উদ্ভব যদিও ধর্মদর্শনকে কেন্দ্র করে, তথাপি উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে প্রাচীন সমাজাচারের বাস্তব চিত্র এতে উঠে এসেছে। জীবন-জীবিকার সংগ্রামের সাথে নৈতিক উৎকর্ষের গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এ গুণোৎকর্ষ নৈর্ব্যক্তিক ও সর্বজনীন আদর্শ হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। তাই জাতক সাহিত্যের উপাদানে সর্বজনীনতার প্রভাব বিদ্যমান।

জাতকের সাহিত্যশিল্প বা রচনাকৌশল অত্যন্ত সরল। ভাবপ্রকাশ রীতি নিতান্ত প্রকৃত। বলা বাহুল্য, সাহিত্যসৃষ্টির অভিপ্রায় নিয়ে গৌতম বুদ্ধ জাতক বিবৃত করেননি। তাঁর শিষ্যদের প্রতি উপদেশনাকালে নিছক উদাহরণ হিসেবে জাতক কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। জাতকের শিল্পরূপ কাহিনিধর্মী বা বৃত্তান্তমূলক হলেও গল্প উপন্যাসের মতো এখানে বিবিধ অনুষঙ্গী ঘটনার সমাবেশ ঘটেনি। অত্যন্ত সরলীকৃত উপায়ে কাহিনি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষত জাতকের উদ্দেশ্য যেহেতু উপদেশ দান, সেহেতু গল্প পরিবেশনার ক্ষেত্রে উপদেশাত্মক মূলভাবকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এরূপ নিরলঙ্কার, নিরবদ্য অভিব্যক্তি সত্ত্বেও বিষয়বস্তুর গুণে জাতক অমূল্য সাহিত্য হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।[৫৪] মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় জাতক সম্পর্কে বলেছেন : "এগুলোর কাঠামো নাই। কিন্তু সব গল্পগুলোই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র।"[৫৫] বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যের গবেষক ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরীর মতে: বহু লেখক তাঁদের রচনার উপাদান এই জাতক কাহিনিগুলো হতে সংগ্রহ করেছেন।[৫৬]

ড. রাধারমণ জানা তাঁর পালি ভাষা সাহিত্য বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দনাথ শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ এই গল্পগুলোকে অবলম্বন করে, সেগুলোকে কিছু পরিমার্জন পরিবর্ধন করে, আধুনিক যুগোপযোগী আকর্ষণীয় কাব্যরসে পরিবেশন করেছেন।[৫৭] এ প্রসঙ্গে ড. জানার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, "জাতক ও অবদানের গল্পগুলোর মধ্যে যে কাব্যগুণ, মানবিকতা ও বাস্তবতার বৃহত্তর সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিলো তা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি।"[৫৮]

সুতরাং জাতক সাহিত্যশিল্পের কাঠামোতে গড়ে না উঠলেও এর বিষয়বস্তুর গুরুত্বের বিচারে এবং প্রাচীন সাহিত্য উপাদানের নিদর্শন হিসেবে এর যথেষ্ট ঐতিহাসকি ও সাহিত্য মূল রয়েছে। এমনকি আধুনিক কালের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের স্পর্শে জাতকের অনেক গল্প পরিমার্জিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করে অমর হয়ে আছে।

আধুনিক সাহিত্যরীতির দিক থেকে বিচার করলে প্রতিটি জাতকের সূচনায় একটি একঘেয়ে ভাব দৃষ্ট হয়। যেমন-"পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময় বোধিসত্ত্ব....কুলে (এভাবেই বোধিসত্ত্বের বুদ্ধপুর্বকালের বিবিধ জন্মের কথা উল্লিখিত হয়) জন্ম গ্রহণ করে।[৫৯] অতপর সেই জন্মের কাহিনি শুরু হয়। এইজন্ম উত্তর কর্মকাণ্ডের কাহিনিই মূল জাতক। এখানেই বিচিত্র ধারার জ্ঞান, নীতি, আদর্শের কথা বর্ণিত হয়। পাঠকের কাছে প্রতিটি জীবনকাহিনিই স্বতন্ত্র ও নতুন দিকনির্দেশনা প্রদান করে। বিষয়ের বৈচিত্র ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার সংযোগে পাঠকের কাছে সূচনার বর্ণিত বক্তব্য কাহিনির সূত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় যা একটি কাহিনি প্রবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাই এই একঘেয়ে রূপটিও পাঠকের কাছে চিত্রাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে। এখানেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে জাতকের সাহিত্য শিল্পের বিশেষত্ব। তাই সাহিত্য-সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে জাতক আমাদের এক অমূল্য সম্পদ।[৬০] এর গঠনশৈলী সর্বজনীন সাহিত্যের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্ববহ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতক কাহিনির সাহিত্যমূল্য দেখা যায় জাতক ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটকের অঙ্গ হলেও এর কাহিনিসমূহে অনবদ্য সাহিত্যরস বিদ্যমান। তাই জাতককে শুধুমাত্র হিতোপদেশক বা বোধিসত্ত্ব জীবনের[৬১] বর্ণনা হিসেবে আখ্যায়িত করলে এর যথার্থ মূল্যায়ন হয় না। যদিও অনেক সাহিত্যসেবীর মতে বিবৃতি বা ইতিহাসের তথ্যপঞ্জি পরিবেশন করলেই কোনো রচনা সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, সাহিত্যে সৃজনী কল্পনার সংযোজন অপরিহার্য।[৬২] জাতক সাহিত্যে সৃজনশীল শিল্পরূপ বিদ্যামান। এছাড়া জাতকের বিষয়বস্তু বিবরণমূলক হলেও, এতে একটি কালের বা যুগের সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম রাজনীতি ও লোকজীবনধারার প্রতিচ্ছবি প্রতিভাত হয়েছে। এই বিবরণ ধারাবাহিক নয়। মূল কাহিনির অনুষঙ্গী হিসেবে স্থান-কাল-পাত্রের পরিচয় প্রদানের জনব্য যে কাহিনির সাথে যতটুকু দরকার সেটুকুই বিস্তৃত হয়েছে। এভাবে জাতকের সাথে প্রাচীন ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস, ঐহিত্য ও পুরাতত্ত্বের বহু বিষয় স্থান পেয়েছে, যা সাহিত্যের দৃষ্টিকোন থেকে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

জাতকে প্রাচীন ভারত উপমহাদেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বিবর্তনের এবং উন্নয়নের বহুমাত্রিক তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যে ধারাবাহিক সংযোগ না থাকলেও আধুনিক সাহিত্য ও ইতিহাসের গতিপরিক্রমার এগুলো অনন্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। বৌদ্ধ তত্ত্বের গবেষক ও ভারত তত্ত্ববিদ্‌দের মতেও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ তেকে এই জাতক কাহিণিগুলোর মূল্য অপরিসীম। যেমন : গবেষক Anukul Chandra Banerjee'র মতে : The Jatakas are of immense value from the points of vies of literature and art.[৬৩]

জাতকেও বাংলা লোককথার ন্যায় বহু উপাদান আছে, যেগুলোতে নির্বুদ্ধিতা, কৃপণতা, কর্মহীনতা, অহংবোধ, ধূর্ততা, চাতুরী ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এগুলো বাংলার লোক সমাজেরই বিষয়। এরূপ লোকজ বিষয় নিয়ে বাংলায় কখন থেকে সাহিত্যকর্ম শুরু হয় তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও গদ্য সাহিত্যের যুগেই যে এটি হয়েছিলো এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা গদ্য সাহিত্য বিস্তারের ইতিহাস দূর অতীতের নয়। কিন্তু জাতক বহু প্রাচীন বিষয় এর সংঘটনকাল খ্রি. পূর্ব তৃতীয় শতক এবং অন্তর্ভূক্ত বিষয় উপকরনের কাল খ্রি. পূর্ব ষষ্ঠ শতক। অর্থাৎ, গৌতম

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের জীবদ্দশাকাল। বাংলা লোকসাহিত্য ও জাতকের মধ্যে রচনাকালের ব্যবধান বহু দূর হলেও ভাবে ও বিষয়ে উভয়ের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কে বিদ্যমান।

বাংলা লোকসাহিত্য জাতক দ্বারা প্রভাবিত কিনা এ বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না হলেও, জাতকের অনেক কাহিনিতে প্রাচীন ভারত উপমহাদেশীয় লোকজীবনের যে ছবি প্রতিভাত হয়েছে সেগুলোকে বাংলা লোকসাহিত্যের আদিরূপ হিসেবে অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং প্রাচীন ভারত উপমহাদেশীয় লোকসাহিত্যের ইতিহাসেও জাতকের বিশেষ মূল্য রয়েছে। লোকসাহিত্যের আদি উপকরণ হিসেবে জাতকের বহু বিষয় বহির্ভারতে গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ TW Rhys Davids এ প্রসঙ্গে বলেন :

"The whole collection forms the most reliable, the most complete, and the most ancient collection of folklore now extant in any literature in the world."[৬৪]

জাতকের অবদান কেবলমাত্র পালি সাহিত্যে কিংবা সংস্কৃত সাহিত্যেই বিদ্ধামান নয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও জাতকের অবদান লক্ষণীয়

আধুনিক বাংলা সাহিত্য গদ্য রচনার কাল। গদ্যের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিপুল প্রসার ঘটেছে। জাতক গদ্য ও পদ্যরীতির মিশ্রণে গঠিত। তবে পদ্যের চেয়ে গদ্য অংশের বিস্তৃতি এতে বেশি। পালি ভাষায় রচিত হলেও ভারত উপমহাদেশীয় গদ্যরীতির প্রাচীন নমুনা হিসেবে এর মূল্য কম নয়। বিশেষ করে বাংলাসহ বিশ্বের বহুবিধ ভাষায় জাতক অনূদিত হয়ে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এর ফলে বাংলা সাহিত্যে জাতকের অবস্থান নিরূপণ সহজসাধ্য হয়েছে।

জাতকের বিষয়বস্তু ধর্মসাহিত্যের অন্তর্গত হলেও সাধারণ সৃজনশীল সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এতে সাহিত্যের প্রায় সকল শাখার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। আধুনিক সাধারণ সাহিত্য আবর্তিত হয়েছে গল্প, নাটক ও উপন্যাসের সৃজনী ধারাতে। জাতক অতি প্রাচীন বিষয় হলেও এর ভাবব্যঞ্জনায় ও কাহিনিবিন্যাসে অনুসৃত ধারা আধুনিক সাহিত্যরীতির সাথে সংগতি বিধান করে। তাই অত্যন্ত প্রাচীন এই জাতক সাহিত্যের কাহিনিসমূহেও আমরা গল্প ও

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাসের স্বরূপ-লক্ষণ খুজে পাই। এগুলোতে ধর্মনিরপেক্ষ সর্বজনীন চেতনারও প্রকাশ ঘটেছে। Prefessor M. Winternitz এ প্রসঙ্গে বলেন :

"Short anecdotes, humorous tales and jokes, which have nothing Buddhist abouth them. Novels and even long romances abounding in advantures, and sometimes with a greater or lesser number of narratives with in the story. Here, too, there is nothing Buddhist, except the hero is the Boddhisatta."[৬৫]

ছোটগল্পের নমুনা হিসেবে আমরা শতধর্মা জাতকের (১৭৯) কাহিনি তুলে ধরতে পারি- এক চণ্ডাল কাজের সন্ধানে বের হলো। কিছু ভোজ্যও সে সাথে নিলো। পথে এক ব্রাহ্মণের সাথে তার দেখা হলো। আলাপচারিতায় উভয়ের পরিচয় ও উদ্দেশ্য পরস্পরের কাছে ব্যক্ত হলো। দেখা গেলো উভয়ের যাত্রাপথ এক। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে সময়ও লাগবে দীর্ঘ। যাত্রাপথে সঙ্গী পেয়ে উভয়েই খুশি হলো। হেঁটে ভোরে যাত্রা বিরতি করলো। এ সময় চণ্ডাল কাছাকাছি একটি জায়গায় পরিষ্কার জল পেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে তার ভোজ্যের পাত্রটি খুলে বসলো। ব্রাহ্মণকুমারকে বলল-ভাই, খাবে এসো। ব্রাহ্মণ অত্যন্ত রাগতস্বরে বলল-বেটা চাঁড়ালা, তোর খাওয়া আমি খাব কেন? চণ্ডাল বললো- বেশ ভাই, নাই খেলে। চণ্ডালকুমার তার খাদ্য পাত্র হতে কিছু বের করে খেয়ে বাকিটুকু আবার সুন্দর করে রেকে দিলো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু করলো। দিনশেষে আবার এক স্থানে উভয়ে বসলো। চণ্ডাল হাত-পা ধুয়ে তার খাবার বের করলো। ব্রাহ্মণকে আর খেতে অনুরোধ করলো না। এ সময় পথশ্রমে ব্রাহ্মণকুমার নিতান্ত ক্লান্ত হলো। ক্ষুধায় তার পেট পুড়ে যাচ্ছিলো। চণ্ডালের দিকে দৃষ্টিপাত করে মনে মনে বলে- এবার খেতে বললে অবশ্যই খাব। কিন্তু চণ্ডাল কোনো কথা বললো না। নীরবে খেতে লাগলো। ব্রাহ্মণকুমার মনে মনে বলে- চাঁড়াল বেটা, কোনো কথা না বলে সমস্ত খাবারই শেষ করে ফেলছে। এখন দেখছি কিছু চেয়ে না নিলে চলবে না। যা দেবে তাতে তার স্পর্শদোষজনিত উপরের গুলো ফেলে ভিতরের গুলোই খাব। ক্ষুধার তীব্র তাড়নায় সে তাই করল। এগুলো খাওয়ার পর তার মনে এখন অন্যরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। সে ভাবল শেষ পর্যন্ত চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খেলাম, হায়, নিজের জাতি, গোত্র, বংশ সবার মুখে কালি লেপন করলাম, ছি ছি! তার ভয়ানক নির্বেদ জন্মাল, সে ভুক্ত খাদ্যের সাথে রক্ত বমি করে দিলো। আর ভাবল তুচ্ছ অন্নের লোভে সে আজ কী গর্হিত

Dhaka University Institutional Repository

কাজই না করলো! এভাবে সে অনুশোচনা করতে লাগলো। শেষে সিদ্ধান্ত নিল কাউকে এ মুখ না দেখিয়ে সে বনবাসী হবে।

এই জাতকে বোধিসত্ত্বের ভূমিকা ছিলো চণ্ডাল রূপে। বোধিসত্ত্বের উপস্থিতি বা জাতকের অন্তরালের বিষয়টি বাদ দিলে এটি নিতান্ত ছোটগল্পের মর্যাদা লাভ করে। জাতকে এরূপ গল্পের সংখ্যা কম নয়।

আবার বৈচিত্র্যময় ঘটনাপূর্ণ দীর্ঘ কাহিনি সম্পন্ন উপন্যাসসমূলক জাতকের সংখ্যাও কম নয়। যেমন মহাজনক জাতক। এই জাতকের কাহিনির সূচনা হয় মিথিলা রাজ্যের মহাজনক নামক রাজার পারিবারিক বর্ণনার মাধ্যমে। রাজার দু-পুত্র। নাম অরিষ্টজনক ও পোলজনক রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপরাজা এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করলেন। কালক্রমে মহাজনক রাজার মৃত্যু হলো।

এদিকে অরিষ্টজনক কুসঙ্গীর পরামর্শে পোলজনককে রাজ্য হতে বিতাড়িত করলেন। এতে পোলজনক রাজদ্রোহী হলেন। সুবিধামত সময়ে তিনি ক্ষমতাসীন অরিষ্টজনককে পরাজিত করে রাজ্য দখল করলেন। এসময় অরিষ্টের অন্তঃসত্তা মহিষী পালিয়ে চম্পা নগরে আশ্রয় নিলেন। সেখানে এক পুত্র প্রসব করলেন। অন্যদিকে পোলজনকের কল্যার মিলন হয়। কাহিনির মধ্যভাগ রয়েছে যুদ্ধ, বিদ্রোহ, সংঘাত, প্রতিহিংসা ভালবাস, প্রেম, রোমান্স সর্বোপরি উত্তরাধিকার ও নৈতিক আদর্শকে তুলে ধরার অঙ্গীকার।

এই জাতকে তিন প্রজন্মের কাহিনি বিধৃত হয়েছে। দীর্ঘ বিস্তৃতির মধ্যে ধারাবাহিকতাও আছে। পরিশেষে সব ভেদাভেদের অবসান ঘটিয়ে হয় মিলন। তাই এটিকে একটি উপন্যাসও বলা যায়। জাতকের এই কাহিনিসমূহ ধারন করে বহু প্রথিতযশা সাহিত্যিক অমর সাহিত্য সৃজনে সমর্থ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ড. রাধারমণ জানা এই তথ্য তাঁর গবেষনা গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।[৬৬]

সুতরাং জাতকের কাহিনিগুলোতে সাহিত্যের বিচিত্র স্বরূপ বিদ্যমান রয়েছে। এগুলোর গভীর গবেষণা ও বিশ্লেষণে আধুনিক সাহিত্য জগতে নতুন মাত্রা যোগ হবে। তাই আধুনিক সাহিত্য

Dhaka University Institutional Repository

জগতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাতকের বিশেষ অবদান বিদ্যমান। এ জাতকসমূহ যত বেশি বিকাশ লাভ করবে ততই আধুনিক সর্বজনীন সাহিত্যভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ হবে।

জাতক হলো নৈতিক শিক্ষার বাহন। গৌতম বুদ্ধ জাতকের মাধ্যমেই জীবনের বাস্তবতা ও নৈতিকতার শিক্ষা দিতেন। জীবজগতের মধ্যে মৈত্রী করুণা মুদিতা ও উপেক্ষার বোধ জাগিয়ে তোলাও জাতকের অন্যতম উদ্দেশ্য। সুশীল সমাজ ও শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতকের শিক্ষা অপরিহার্য। এমকি ব্যক্তির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যও এর বিকল্প নেই (ধর্মদর্শন মতে)। এছাড়া গৌতম বুদ্ধ প্রজ্ঞাপিত পরম শান্তি নির্বাণ লাভের জন্যও আদর্শিক জীবনাচার পালন বা সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতার অনুশীলন অপরিহার্য। কিন্তু এ বিষয়ে বলা যত সহজ দৈনন্দিনের কর্মে এসব ব্যবহার করা তত সহজ নয়। কারণ মানুষ জন্মের সাথে সাথে উত্তরাধিকাররূপে সংস্কার হতে বিষয়ভাবনার প্রবৃত্তিও কোনো সীমা পরিসীমা নেই। নানাবিধ আকাঙ্খায় জর্জরিত মানুষের চিত্ত। এসময় প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির কারণে মানুষের অন্তরে জন্ম নেয় সন্তোষ, অসন্তোষ, ক্রোধ, হিংসা ভালবাসা। বৈষয়িক কারণেই সৃষ্টি হয় মানুষের অন্তর্দাহ। অথচ এই বিষয়কে ছেড়েই সবাইকে যেতে হবে নৈসর্গের ওপারে। কারণ জীব-জগৎ সকলই অনিত্য। সর্বদা পরিবর্তনশীল। উৎপন্ন সকল কিছুরই বিনাম অনিবার্য। তাই জন্ম মাত্রই দুঃখ। কারণ জন্মতেই জরা-ব্যাধি ও বার্ধক্যের অসহনীয় দুঃখ নির্ধারিত হয়। কর্মের মাধ্যমে এই পুনঃপুন জন্মগ্রহণকে রোধ করা যায়। এর জন্য জন্ম-জন্মান্তরের কর্মসাধনা প্রয়োজন।[৬৭] এই ধারাবাহিক কর্মসাধনই পারমী। এই জন্ম-জন্মন্তরের নিরবচ্ছিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানে জগৎ জীবনকে অনিত্য চেতনায় দেখতে হয়। অনিত্যরূপে দর্শনের যে সুফল এবং নিত্যরূপে দর্শনের যে করুণ পরিণতি তার ব্যাখ্যা প্রতিভাত হয়েছে গৌতম বুদ্ধের পূর্ব জীবন বৃত্তান্তসমূহে। এগুলোই জাতক। এতে প্রাচীন সমাজবাস্তবতার প্রকৃত ছবিও অনুষঙ্গী বিষয় হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিটি মানুষ স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশকে আশ্রয় করে জন্মগ্রহণ করে এবং জীবন গড়ে তোলে। জীবন গড়ে তোলে। জীবনের সাথ সমাজ, রাষ্ট্র সংস্কার, আদর্শ ইত্যাদির প্রভাব জড়িত

Dhaka University Institutional Repository

থাকে। তাই জাতকে বর্ণিত জীবন কাহিনিসমূহেও প্রাচীন ভারত উপমহাদেশের জীবনযাত্রা, ধর্ম, সংস্কৃতি, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, রাজনীতি, যুদ্ধ, রাজ্যপরিচয়, ভৌগোলিক সীমানা, ইত্যাদি বিষয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এগুলো অনুষঙ্গী বিষয় হলেও ঐতিহাসিক বিচারে এগুলোর মূল্যও কম নয়। এগুলোর ব্যঞ্জনার ধর্মীয় ভাবের চেয়ে সাহিত্য ভাবের আধিক্য বেশি। শ্রেণি সম্প্রদায়কে উর্ধ্বে রেখে মানবিক উৎকর্ষ সাধনের সর্বজনীন চেতনার এইসাহিত্য বি্কাশ লাব করেছে। তাই জতক একটি মননশীল সাহিত্য। ধর্মনিরপেক্ষ সাধারণ সাহিত্য। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জাতক সেই সেই ভাষা-সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলায়ও জাতক অনূদিত হয়েছে। জাতকের বহু উপাদান পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যে নানা সুবাদে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সুতরাং বিশ্বসাহিত্য, বাংলা সাহিত্যের তথা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের উৎকর্ষের ধারায় জাতকের অবদান অনষিকার্য।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯ পৃ. ৩৫৬

২. বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বৌদ্ধ পারমীতত্ত্ব, সুমন কান্তি বড়ুয়া, পিএইচ,ডি গভেষণা অভিসন্দর্ভ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ফয়েজুন্নেছা বেগম, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১-২

৪. পূর্বোক্ত, ফয়েজুন্নেছা বেগম, পৃ.২

৫. পূর্বোক্ত, মহাকবি কালিদাস, পৃ.১৩৮

৬. পূর্বোক্ত, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৫

৭. সংস্কৃত সাহিত্য সংকলন, রনজিত কুমরা মজুমদার, ষষ্ঠ সং, কাকলি প্রেস, খুলনা, ২০০৭ পৃ. ৬

৮. Ibid, A History of Indian Literature, Vol. I. M Winternitz, P. 220

৯. সুমন কান্তি বড়ুয়া, মহাকিব অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্য কীতি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০২, ঢাকা, পৃ. ১৩২

১০. Sukumar Sen, An outline syntax of Buddhistic Sanskrit, Journal of the Department of Letters, Vol. XVII, Calucutta University Press, 1928, P.119

১১. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার দ্বিতীয় খণ্ড, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রকাশকঃ শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি.এম.লাইব্রেবী, ৪২, বিধান সরনী, কলিকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৩৭১, পৃঃ ১-৩

১২. পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৪

১৩. The Buddhist Council and Development of Buddhism, Dr. Sumangal Barua, Calcutta, 2005, P.45

১৪. পূর্বোক্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২

১৫. পূর্বোক্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২

১৬. Early Monastic Buddhism, Nalinakha Dutt. Calcutta Oriental Book Agency, Calcutta, 1941, P. 331

১৭. মহাপরিনির্বাণ সূত্র, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৪১, পৃ. ২২৪/ Cullavagga, P. 286

১৮. সব্বকামী চ সাল্হো চ খুজ্জসোভিত নামকো,

বসভ গামিকো চাতি থের পাচিনকা ইমে,

Dhaka University Institutional Repository

রেবত সান সম্ভুতো যসো কাকন্ক এজো,

সুঝনো চাতি চত্তারো থের পাবেয্যকা ইমে। দীপবংস, ভাণবারং পঞ্চমং, গাথা নং ২২-২৩

১৯. Jagatjyoti, Buddhajayanti Number, 1956, pp.98-100

২০. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ড. মনিকুন্তলা হালদার দে, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৪২

২১. Buddhism, Rhys Davids London, 1903, p. 222

২২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ড. মনিকুন্তলা হালদার দে, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৭

২৩. A History of Indian Literature, M. Winternitz, Vol. II, Delhi, 1999, P.9-10

২৪. Buddhist Council and Development of Buddhism, Dr. Sumangal Barua, Calcutta, 1997, p.124

২৫. Buddhistic Studies, B.C Law, p. 71, Smit: E.H.I, PP. 28/Rhys Davids, Buddhism, 1903, P.238

২৬. Rhys Davids, buddhism, 1903, PP. 238-239

২৭. Rabindra Bijay Barua, The Theravada Sangha, The Asiatic Society of Bangladesh, 1978, p. 342

২৮. পূর্বোক্ত, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, পৃ. ১৬৭/Rabindra Bijay Barua. The Theravada Sangha. P. 345

২৯. Nalinaksha Datta. Mahayana Buddhism Calcuttta. 1985.p.65

৩০. পূর্বোক্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃ. ৩৪১/Mahavamsa/Dipavamsa

৩১. পূর্বোক্ত, বৌদ্ধদর্শন, অমিত ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৫

৩২. T. W. Rhys Davids, Pali-English Dictionary, Munshiram Manoharlal Publishers, New Delhi, P. 281

৩৩. বোধিসত্ত্ব অর্থে বুদ্ধাঙ্কুর বা বুদ্ধত্ব অর্জনে অনুগামীকে বোঝানো হয়।

৩৪. জাতক সাহিত্যে বা পূর্ব জীবন কাহিনিসমূহে বর্ণনামূলক অবদান সাহিত্যে ৫৫০টি পূর্বজন্মের উল্লেক দৃষ্ট হয়। সূত্রপিটকে অবশ্য আরো অন্যান্য জন্মের বিচ্ছিন্ন ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. TW Rhys Davids: Buddhist India, p.196

৩৬. মহিন্দ থেকে সম্রাট অশোকের পুত্র।

৩৭. সুবণ্ণভূমি বলতে বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) প্যাগান হতে মালয় উপসাগর পর্যন্ত, পশ্চিমে ভারত, পূর্বে চীন উভয়ের মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভূ-ভাগকে সুরণ্ণভূমি বোঝায়। শাসনবংশ, পৃ.১৭।

৩৮. এটি 'যবন' জনগণের রাজ্য (রাহুল সাংস্কৃত্যাযন, ভোলগা তেকে গঙ্গা) ও মিলন্দ-প্রশ্ন মতেএটি কাবুলের সীমান্তবর্তী একটি রাজ্য।

৩৯. মহাবংস গ্রন্থ মতে উত্তর কানারা বনবাসী রাজ্য নামে অভিহিত হতো।

৪০. এটি পশ্চিম রাজপুতনা, কচ্ছ (Cutch), গুজরাট এবং নিম্ন নর্মদার তীরবর্তী অংশ- B C Law: Geography of Early Buddhism. p.56.

৪১. একটি চীন সাম্রাজ্যের নিকটবর্তী গান্ধারের পেশোয়ার জেলা ও কাশ্মীর নিয়ে গঠিত; প্রাগুক্ত।

৪২. চন্দন পাহাড়ের সমীপে এর অবস্থান-শাসনবংশ।

৪৩. এটি বর্তমান মহারাষ্ট্র প্রদেশ- B C Law: Geography of Early Buddhism.

৪৪. এটি বর্তমান চীনের ভারত সীমান্তবর্তী অংশ-শাসনবংশ।

৪৫. ড. রাধারমণ জানা: পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ.৩৬।

৪৬. প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার দ্বিতীয় খন্ড, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রকাশন: শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি.এম. লাইব্রেরী ৪২, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৩৭১, পৃ: ২৪১-২৪৪

৪৭. সুকুমার সেন, রাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা, ১৩৮৬, পৃ.১৮১।

৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য (যুগের প্রবন্ধে), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৪,পৃ. ১১২।

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

৫১. সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাহা, ১৩৮৬, পৃ. ২১৪।

৫২. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯৫, পৃ.২৫৮।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ.২৫৮।

৫৪. Anukul Chandra Banarjee, Buddhism in India and Abroad, Calcutta. 1973, p.137.

৫৫. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ : ৩য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ.৫৮২।

৫৬. ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, কলিকাতা, ১৪০২, পৃ. ৮৫।

৫৭. ড. রাধারমণ জানা, পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ১৩০।

৫৮. প্রাগুক্ত।

৫৯. অতীতে বারাণসিযং ব্রহ্মদত্তে কারেন্তে বোধিসত্ত্বে.....কুলে নিব্বত্তিত্বা।

৬০. Anukul Chandra Bajarjee, Buddhism in India and abroad, Calcutta. 1973, p.137.

৬১. TW Rhys Davida Buddhist India, p. 196

৬২. ১ম খণ্ড, ৭৪নং জাতক।

৬৩. Anukul Chandra Bajarjee, Buddhism in India and abroad, Calcutta. 1973, p.137.

৬৪. TW Rhays Davvids: Buddist India. P.2085.

৬৫. A History of Indian Literature: Vol-II M winternit.p.125.

৬৬. জাতক ও অবদান ছাড়াও সুবিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যধারা বিচিত্ররূপে রবীন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ড. রাধারমণ জানা, পালিভাষা সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ.৭৪।

67. The Popularty of the doctrine of Karma and of the cult of Paramitas is evidence by the prevalence of Jataka tales and art illustration of the period. Dr. Lalmoni Joshi, Studies in the Buddhist Culture of India.p.9.

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

মহাকবি অশ্বঘোষের জীবনী আমাদের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর জন্মকালীন সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই কারণে উপর্যুক্ত উৎস সমূহে যে জীবনী পাওয়া যায় তা অশ্বঘোষের অনেক পরবর্তীকালে রচিত হওয়ার ইতিহাস ও লোক কাহিনির সংমিশ্রণে গড়া বলে ধারণা করা হয়। ফলে নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে উপর্যুক্ত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ চিহ্নিত করে অশ্বঘোষের ইতিহাসসম্মত জীবন চরিত সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হলো।

২. অশ্বঘোষের সময়কাল

ঐতিহ্য সমূহে মহাকবি অশ্বঘোষের সময়কাল সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই এ বিষয়ে মতানৈক্যও দেখা যায়। নিম্নে অশ্বঘোষের সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহ্যের তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

বুদ্ধচরিতম্[১] গ্রন্থ মতে, সপ্তম শতকের বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ বলেছেন, অশ্বঘোষ, দেব, নাগার্জুন, কুমার লব্ধ (কুমারলাতের বিকৃত পাঠ) চারটি সূর্য যা পৃথিবীকে আলোকিত করেছে। ধারণা করা হয়; কুষাণ বংশীয় নরপতি কণিষ্কের সময়কালে নাগার্জুন, বসুবন্ধু এবং অশ্বঘোষের আবির্ভাব হয়। সৌন্দরনন্দ কাব্য[২] মতে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নাগার্জুনের কাল খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে স্থির করেছেন। এরূপ হলে অশ্বঘোষ নাগার্জুনের অন্ততঃ শতাব্দী কাল পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকে জীবিত ছিলেন। Life of Vasuvandhu[৩] শীর্ষক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 'অশ্বঘোষ কাত্যায়নের সমসাময়িক ছিলেন'। অর্থাৎ বুদ্ধনির্বাণের পর পঞ্চম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ[৪] গ্রন্থ মতে, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের ভাষ্যে দেখতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেবের নিবার্ণের প্রায় তিনশত সপ্তদর্শ বর্ষ পরে অশ্বঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্য[৫] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ ছিলেন সম্রাট কণিষ্কের (খ্রিষ্টীয় প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দী) উপদেষ্টা ও সভাকবি ও চরক ছিলেন চিকিৎসা সংক্রান্ত উপদেষ্টা। পার্শ্ব অথবা তদীয় শিষ্য পূণ্যযশ ছিলেন অশ্বঘোষের শিক্ষাগুরু তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ১ম খণ্ড[৬] উল্লেখ আছে,

Dhaka University Institutional Repository

কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্টপোষকতায় অশ্বঘোষ ধর্মীয় ও সাহিত্য জগতে বহু ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কণিষ্কের রাজত্বকাল খ্রিষ্টীয় ৭৮ হতে ১০১ অব্দ পর্যন্ত। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত[৭] গ্রন্থ, মতে, কণিষ্কের রাজত্বকাল খ্রিষ্টীয় ১২৫-১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তবে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে প্রথমে উল্লেখিত খ্রিষ্টাব্দই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ কণিষ্ক ছিলেন কুষান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি তাঁর খ্যাতির বিস্তার ও রাজ্য বিস্তার উভয়ই ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা[৮] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের রাজসভায় বর্তমান ছিলেন। ভিন্‌সেন্ট স্মিথ বলেন- নাগার্জান, অশ্বঘোষ এবং বসুমত্রি- এই তিন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক কণিষ্কের স্মৃতির সাথে জড়িত। কণিষ্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের সম্রাট। বৌদ্ধ ভারত[৯] গ্রন্থ মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষে কুষাণ-যুগের সূত্রপাত হয় ইন্দু-ব্যাক্ট্রিয়াম ও সিথো-পার্থিয়ান যুগের পর। এই ব্যাকট্রিয়ান গ্রিক রাজাগণ প্রায় খ্রিষ্টীয় ২৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজত্বের অবসানের মধ্য দিয়েই কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিস্তার লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুজুল কদফিসেস। তিনি খ্রি. ২৫-৬৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস খ্রি. ৬৫-৭৫ অব্দে রাজত্ব করেন। কণিষ্ক হলেন বিম কদফিসেস এর পুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে বিম কদফিসেস এর পরই কণিষ্কের রাজত্বের সূচনা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিকদের মতে, কণিষ্কের রাজত্বকালের সূচনা হয় খ্রি. ৭৮ অব্দ হতে। এই ক্ষেত্রে এটিই অনুমান করা যায় যে, পূর্বের দুই বছর কণিষ্ক হয়ত অস্থায়ী রাজা ছিলেন এবং খ্রিঃ ৭৮ এ তাঁর অভিষেক হয়। প্রাচীন ভারতের নৃপতিদের মধ্যে সম্রাট কণিষ্ক রাজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রসার ও প্রচারের জন্য উল্লেখ হিসেবে এখানো সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে সুপরিচিত হয়ে আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা, ৪র্থ খণ্ড[১০] মতে, সম্রাট কণিষ্ক ও অশ্বঘোষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বহুল প্রচলিত একটি জনশ্রুতি রয়েছে এরূপ- একদা সম্রাট কণিষ্ক রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মগধ আক্রমণ করে রাজধানী পাটলিপুত্র অধিকার করেন। সেই সময়ে অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করে উচ্চতর বৌদ্ধ দর্শনের গবেষণার কাজে নিয়োজিত হয়ে পাটলিপুত্রে অবস্থান করেছিলেন। তদানীন্তন মগধ যুদ্ধের পরিনাম চিন্তা করে নিরুপায় হয়ে মুদ্রার

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময়ে কণিষ্কের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। এই ক্ষেত্রে সম্রাট কণিষ্ক নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা দাবি করলেন। মগধরাজের এত মুদ্রা মওজুদ ছিলো না। কারণ ইতিপূর্বের যুদ্ধে কোষাগার প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিলো। পরিশেষে উভয় পক্ষের আলাপ-আলোচনার পর মগধরাজ তিন কোটি মুদ্রা দিলেন। বাকী মুদ্রা বাবদ কণিষ্কের দাবি অনুসারে পণ্ডিত অশ্বঘোষকে দিলেন। কণিষ্কে তাঁকে সদরে গ্রহণ করলেন। এতে প্রাচীন ভারতবর্ষে অশ্বঘোষের ব্যক্তিত্বের প্রভাব সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পেয়ে থাকি। এরপর হতে আজীবনের জন্য অশ্বঘোষ কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড[১১] মতে, মহাকবি অশ্বঘোষ কণিষ্কের রাজসভার অধ্যাত্মিক ধর্মীয় রাজগুরু ছিলেন। এতে অশ্বঘোষের ধর্ম ও সাহিত্য চর্চার কোনোরূপ অসুবিধা হয়নি। এবং অনুকূল পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক সহায়তায় তাঁর চর্চার গতি আরো তীব্রতর হয়েছিল। ফলে তৎকালে অশ্বঘোষ একজন স্বনামধন্য খ্যাতিমান ধর্ম ও সাহিত্যের পণ্ডিত ছিলেন। ইতিহাসে প্রসিদ্ধি আছে যে, একমাত্র অশ্বঘোষের কারণেই সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী, অনুসারী ও সর্বোপরি পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। অশ্বঘোষের ধর্ম দর্শন প্রীতি দেখে সম্রাট এতই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার-প্রসারে তাঁর সর্বাত্মক আন্তরিক সহযোগিতা প্রদানের উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অশ্বঘোষের অনুপ্রেরণায় সম্রাট কণিষ্ক পুরুস্পুরে (পেশোয়ার)- [অনেকের মতে জলন্ধর] চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতের আয়োজন করেছিলেন।' এই বৌদ্ধমহাসঙ্গীতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য বসুবন্ধু ও সহযোগী সভাপতি ছিলেন আচার্য অশ্বঘোষ। সাত মাসকাল স্থায়ী ছিলো এই অধিবেশন। এ সময় মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ "বিভাষাশাস্ত্র" একটি পরিপূর্ণ সাহিত্যরূপ পায়। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষের আবির্ভাব কাল প্রথম শতাব্দী। মহাকাব্য ও মতাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ[১২] মতে, কণিষ্কের রাজত্বকালে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করেন। তাই অশ্বঘোষ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ মতাবলম্বী বিখ্যাত বৌদ্ধ সংস্কৃত দার্শনিক। তখন বৌদ্ধ ধর্ম সর্বত্র বিশেষ ভাবে অশ্বঘোষের সংস্কৃত কাব্যের মাধ্যমে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলো। পণ্ডিতদের অভিমত, অশ্বঘোষ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। আর্যশূর, মাতৃচেতা প্রভৃতি অশ্বঘোষের নামান্তর। তিনি প্রথমে সর্বাস্তিবাদী ভিক্ষু উত্তরকালে মহাযান মত অনুসরণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। সাকেতের বলাকারাম বিহারে আচার্য ধর্মসেন স্থবিরের কাছে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে প্রব্রজিত হয়ে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন। উপসম্পাদা জীবন গ্রহণ করে অশ্বঘোষ সাকেতের 'আর্য সর্বাস্তিবাদ সংঘের' প্রধান বিহার বালাকারামে দীর্ঘদিন অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। এ সময় মগধ (পাটালিপুত্ত) ছিলো বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিচর্চার মূল প্রাণকেন্দ্র। চৈনিক পণ্ডিতদের মতে অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের ধর্মীয় উপদেষ্টা এবং চরক চিকিৎসা উপদেষ্টা ছিলেন।[১৩] এই মন্তব্যকে সমর্থন করে পালি সাহিত্যের ইতিহাস[১৪] গ্রন্থে বলা হয়েছে এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অশ্বঘোষের সময়কাল অন্তত কণিষ্কের রাজত্বকালে অর্থাৎ প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী পড়বে। উপর্যুক্ত তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে বলা যায় অশ্বঘোষের সময়কাল খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দী।

৩. অশ্বঘোষের জীবন

অশ্বঘোষের জীবনপ্রবাহ বহুবিচিত্রি ও বিস্ময়কর। বহুবিধ ঘটনার পরিপূর্ণ। এইগুলো বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হলেও প্রতিটি ঘটনাই তাঁর জীবনের গতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। এগুলোর ধারাবাহিক ঘটনাক্রম কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকলেও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত খন্ড জীবনীর সংযোজনে যে ইতিহাস দাঁড়ায় তা নিম্নরূপ।

যৌবনে অশ্বঘোষ ছিলেন-একজন উদার চেতনাসম্পন্ন, প্রকৃতি ও আধ্যাত্মিক প্রেমিক, গায়ক ও সমাজকল্যাণ ও সামাজিক সংস্কারের নিরলসকর্মী। তবে সর্বক্ষেত্রে সৃজনশীলতার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি। তাঁর তিব্বতী জীবন বৃত্তান্তে দেখা যায়-"যৌবনে অশ্বঘোষ ছিলেন অমিত প্রভাবশালী ও অসীম উদ্যোগী। এমন কোনো সমস্যা ছিলো না যার সামাধান অশ্বঘোষ করতে পারতেন না। প্রবল বায়ু যেমন জীর্ণ বৃক্ষকে ধূলিসাৎ করে তেমনি তিনিও তাঁর বিরোধী পক্ষকে প্রজ্ঞাদীপ্ত বাস্তব যুক্তিতর্কে পরাস্ত করতেন।"[১৫] এই জীবন বৃত্তান্তে আরো উল্লেখ আছে যে, কবি অশ্বঘোষ নিজে একজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী এবং সুরস্রষ্টা ছিলেন; নিজে গান রচনা করে তাতে তিনি নিজেই সুরারোপ করতেন। তারপর তাঁর সঙ্গীত শিল্পীদল নিয়ে বিভিন্ন স্থানে গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর গানের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিলো-জীবনের দুঃখ এবং ক্ষণস্থায়িত্ব বা অনিত্যতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা। অশ্বঘোষের গান প্রাচীন ভারতবাসীর

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়-মনকে এত আকর্ষণ করেছিলো যে, শুধুমাত্র গানের জন্য অশ্বঘোষের নাম দীর্ঘদিন ধরে লোকমুখে চিরঞ্জীব হয়ে আছে। অশ্বঘোষের গান ও কবিতার আর একটি উদ্দেশ্য ছিলো প্রাচীন ভারতের চলমান শ্রেণীভেদকে ভেঙ্গে সকলকে একসূত্রে প্রথিত করা। সংকীর্ণতাকে উচ্ছেদ করে সংস্কার অভীলাসী হওয়া। এটি তাঁর শুধু লেখায় নয়, যৌবনের সংগ্রামও বটে। হিউয়েন সাঙ বলেছেন: "জগতকে আলোকিত করেছে চারটি সূর্য-অশ্বঘোষ, দেব, নার্গাজুন ও কুমার লাভ।"[১৬]

যৌবনে অশ্বঘোষের নাম ভারতবর্ষের অযোধ্যা, কৌশল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় তীব্রগতিতে ছড়িয়ে পড়েছিলো-সঙ্গীত শিল্পী, নাট্যাভিনেতা ও নাট্যকার হিসেবে পার্শ্ববর্তী প্রায় সব অঞ্চল হতে এ বিষয়ে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতো। এমনি এক নিমন্ত্রণ এসেছিলো কোশল রাজ্যের 'যবন' এলাকা হতে নাট্য নির্দেশনার জন্য। নাটকের নাম ছিলো 'ঊর্বশী বিয়োগ'[১৭]। এই নাটকের নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অশ্বঘোষের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে যায়। যা তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন-সাধনা ও জীবন পরিকল্পনার স্রোতকে পর্যন্ত প্রবাভিত করেছিলো।

নাটক নির্দেশনাকালে অশ্বঘোষের পরিচয় ঘটে যবন পরিবারের মেয়ে প্রভার সাথে। প্রভা এই নাটকের প্রধান নারী চরিত্রের অভিনেত্রী। সে ছিলো অত্যন্ত সুশ্রী ও গম্ভীর প্রকৃতির যুবতী। দেখে মনে হয়-কোনো মৃৎ শিল্পীর নির্মিত অনুপম মর্মর নারী মূর্তি। তার পিতার নাম দত্তমিত্র। তিনি ছিলেন কোশালের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও প্রভাবশালী সামাজিক ব্যক্তিত্ব। দত্তমিত্র পূর্ব-পুরুষের রীতি অনুসারে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এদিকে অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীর ছেলে। ধর্মের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও নাট্যকার মহড়াকালে অশ্বঘোষ ও প্রভাব পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ধর্মের দেওয়াল ভেঙ্গে দু'জনই পরস্পরকে ঘিরে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলো। পারস্পারিক আলোচনায় উভয়ে সিদ্ধান্তও নিলো স্বপ্ন বাস্তবায়নের। শুধু সময়ের অপেক্ষা, কিন্তু সময় তাঁদের সে সুযোগ দিলো না। উভয়ের একাগ্র ইচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তাঁদের মিলন সম্ভব হলো না। কিন্তু মিলনের বিপরীতে যে বিরহের সৃষ্টি হলো, তা অভূতপূর্ব ভালোবাসার দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষ ও প্রভার আন্তরিক সম্পর্ক সুদৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠার প্রাথমিক কারণ হলো-প্রভা ছিলো অশ্বঘোষের মতো উদারপ্রাণা। তৎকালীন নারীসমাজে সে ছিলো সংস্কার মুক্ত, সৃজনশীল ও অগ্রসরমনা। তৎকালীন নারীসমাজ সে ছিলো সংস্কার মুক্ত, সৃজনশীর ও অগ্রসরমনা। নাটকের মহড়ার পূর্বেও কয়েকবার অশ্বঘোষের সাথে প্রভার সাক্ষাৎ হয়েছিলো। সে সময়ই অশ্বঘোষ চরিত্রবৈশিষ্ট্য এই অদ্ভুত মানবিক কল্যাণকামিতার অনুপ্রেরণা দেখে। তাই প্রথম আলাপচারিতার লগ্ন হতেই মূলত তাঁদের আন্তরিক সম্পর্কের ভিত গড়ে ওঠে।

অশ্বঘোষের সাথে প্রভার প্রথম দেখা হয় সাকেতের যবন এলাকার একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান যেখানে তাঁরা একে অপরের গানে মুগ্ধ হয়ে পরস্পর পরস্পরকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

দ্বিতীয়বার দেখা হয় সাকেতর ঐতিহ্যবাহী "বসন্তস্নান"[১৮] উৎসবে। এই বসন্তস্নান উৎসবে সাঁতার প্রতিযোগিতায় এক বছর তাঁরা দুজনে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সকলের দৃষ্টি কেড়েছিলো। সেই থেকে তাঁদের মধ্যে বিরাজমান সখ্য ক্রমান্বয়ে দৃঢ় হয়ে ওঠে, যা দীর্ঘদিন পরে নাটকের মহড়াকালে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে জন্মগত কারণে বিদ্যমান ধর্মীয় অসংগতি তাঁর একান্ত ইচ্ছাকে মাটি করে দেয়। এই বিরহ বেদনাই মূলত অশ্বঘোষকে মহৎ হতে মহোম্মম পর্যায়ে উন্নীত করে। তিনি এই ঘটনা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং জীবনকে নুতন পথে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিরূপায় হয়ে প্রভা আত্মহুতি দিলো সরযুনদীর পানিতে। অশ্বঘোষ হলেন পরাজিত, পৌরষিক চেতনায় জর্জরিত। অবশেষে প্রভার ধর্মে (বৌদ্ধধর্ম) ধর্ম-দর্শনের সারতত্ত্ব অন্বেষণে ব্রতী হলেন, সাকেতের 'বলাকারাম বিহারের' প্রধান পুরোহিত শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবিরের কাছে গিয়ে তিনি উপসন্ধদা[১৯] গ্রহন করলেন। এ ব্যাপারে তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর কাকা ভিক্ষু শুভগুপ্তকে দেখে। তিনি বৌদ্ধধর্মের উদার নীতির প্রতি আকৃষ্ট বহু আগে ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধভিক্ষু পদে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেছিলেন। তিনি সাকেতের "বলকারাম বিহারে" সহ-প্রধান আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন।[২০]

৪. অশ্বঘোষের বংশ পরিচয়

অশ্বঘোষের বংশ পরিচয় উদ্ধার করার জন্য বিভিন্ন মনীষী, পণ্ডিত ও দার্শনিকরা নানা চেষ্টা করেছেন। কারণ প্রাচীন ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। আপন স্থান,

Dhaka University Institutional Repository

কাল এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁদের ছিলো অনীহা। তাঁদের প্রত্যাশা ছিলো সৃষ্টি সার্থক হোক। মহাকবি অশ্বঘোষও ব্যতিক্রম ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রকৃত বংশগত পরিচয় জানা খুবই কষ্টসাধ্য। তবে তিনি তাঁর রচিত সৌন্দরনন্দ কাব্যের শেষাংশে নিজেই আংশিক পরিচয় দিয়েছেন।

আর্য সুবর্ণাক্ষী পুত্রস্য সাকেতস্য ভিক্ষোরাচার্য
ভদন্তা অশ্বঘোষস্য মহাকবে মহাবাদিনঃ কৃতিবয়ম্ ।[২১]

অর্থাৎ, সাকেতের মহাকবি, মাহাবাগ্মী, ভিক্ষু, আচার্য আর্যসুবর্ণাক্ষীর পুত্র অশ্বঘোষ এই কাব্য রচনা করেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাকেত[২২] ছিলো তাঁর জন্মভূমি। মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। তবে তিনি পিতার নাম কাব্যে উল্লেখ করেননি। এ কারণে অন্য কোনো ঐতিহাসিক তাঁর পিতার নাম কোথাও উল্লেখ করে যেতে পারেন নি। তিনি এখানে মাতা সুবর্ণাক্ষীর পূর্বে আর্য[২৩] শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষের বংশ ছিলো কুলীন, ব্রাহ্মণ[২৪] বা সদ্বংশজাত। অর্থাৎ, অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে ঐতিহাসিক লামা তারনাথ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের সূত্র ধরে উল্লেখ করেছেন অশ্বঘোষ সংঘগুহ্য[২৫] নামক এক ধনী ব্রাহ্মণের পুত্র এবং পরে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেন। তারনাথের উল্লেখিত তথ্য গ্রহণযোগ্য বলে গবেষকরা মনে করেন। কেননা অশ্বঘোষ অতি অল্প বয়সেই ত্রি-বেদ[২৬] ও কলাবিদ্যা সমাপ্ত করেছিলেন। যেহেতু অশ্বঘোষের পিতা ছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ সেহেতু বংশের পুত্র সন্তান হিসেবে ত্রি-বেদ জ্ঞান অর্জন তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রীতিবদ্ধ ছিলো। উপরে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে শুধু এটুকুই অশ্বঘোষের বংশ ও পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর কোনো তথ্য উদঘাটন করা কোনো গবেষকদের সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি।

৫. অশ্বঘোষের বাল্যকাল

Dhaka University Institutional Repository

একমাত্র অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্য গ্রন্থেই বাল্যকাল সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বঘোষের অন্যান্য সাহিত্যকর্ম বা অন্য কোনো ঐতিহ্যে উল্লেখ পাওয়া যায়। না। এ গ্রন্থের শেষ শ্লোকে তিনি নিজেই নিজের আংশিক পরিচয় তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন,

আর্য সুবর্ণাক্ষী পুত্রস্য সাকেতস্য ভিক্ষোরাচার্য

ভদন্তা অশ্বঘোষস্য মহাকবে মহাবাদিনঃ কৃতিবয়ম্ ।[২৭]

অর্থাৎ, সাকেতের মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু, আচার্য আর্যসুবর্ণাক্ষীর পুত্র অশ্বঘোষ এই কাব্য রচনা করেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাকেত ছিলো তাঁর জন্মভূমি। মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। তবে তিনি পিতার নাম কাব্যে উল্লেখ করেননি। এ কারণে অন্য কোন ঐতিহাসিক তাঁর পিতার নাম কোথাও উল্লেখ করে যেতে পারেননি। অশ্বঘেষের পিতা একজন স্বচ্ছল ও কুলীনব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে তিনি পারিবারিক ঐতিহ্যে অতি অল্প বয়সেই ত্রি-বেদ ও কলাবিদ্যা সমাপ্ত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এ ছাড়া জ্যোতিবির্দ্যা, আয়ুর্বেদ, কলাশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো। আমরা জানি যে, তদানীন্তন ভারতবর্ষে পারিবারিক ঐতিহ্য ছাড়া কখনও এটি সম্ভব ছিলো না। কারণ, ব্রাহ্মণ বংশের পুত্র সন্তান হিসেবে ত্রি-বেদে জ্ঞান অর্জন তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রীতিবদ্ধ ছিলো। তিনি যে সকল সাহিত্যকর্ম পর্যঅলোচনা করেছেন তা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন তা সত্য বলে মনে হয়। তাছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ এবং অন্যান্য ঐতিহ্যেও এ বিষয়ে সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে বুদ্ধরচিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্র প্রকরণ-এ তিনটি যে অশ্বঘোষের রচনা সে বিষয়ে পণ্ডিতব্যক্তিরা দ্বিমত পোষণ করেননি তা নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থত্রয় প্রথমে সংস্কৃতি ভাষায় পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে।[২৮] পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ভাষায় অনূতিদ ও প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজের বিশেষে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ফলে অশ্বঘোষ প্রখর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তা সিদ্ধান্ত করা যায়।

৬. অশ্বঘোষের উপসম্পদা জীবন

Dhaka University Institutional Repository

উপসম্পাদা গ্রহণের পর অশ্বঘোষের জীবনে উন্মোচিত হলো এক নতুন দিক। ধার্মিক জীবন-যাপনের চেয়ে ধর্মের সারার্থকে আত্মস্থ করাই তিনি মূখ্য কাজ বলে মনে করলেন। তাই আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে অধ্যয়ন তাঁর নিয়মিত কার্যক্রমে অঙ্গীভূত হলো। সাকেতের "আর্য সর্বঅস্থিবাদ সংঘের"[২৯] প্রধান বিহার বলাকারামে দীর্ঘদিন অতিবাতি করে, উচ্চতর বৌদ্ধ, দর্শনে জ্ঞান লাভের জন্যে মগধের পাটলিপুত্রের যেতে মনস্থ করলেন। সে সময় পাটলিপুত্র ছিলো পাটলিপুত্রে প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিবর্তে নব সংস্কার প্রাপ্ত 'সংস্কৃত' ভাষারই প্রাধান্য ছিলো বেশি।[৩০] সে সাথে চলছিলো থেরবাদ (হীনযান) বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের চেয়ে মহাযান ধর্মদর্শন চর্চার প্রবল জোয়ার ছিলো। শিক্ষানুরাগী অশ্বঘোষ অনুশীলনের বিষয় হিসেবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃত ভাষা এই উভয়টিকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মগধে (পাটলিপুত্রে) আসার পর অশ্বঘোষের চৈতন্যে ধর্মেও দর্শনতাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের অভীপ্সা আরো গভীরভাবে রেখাপাত করলো। এ সময় তিনি বৌদ্ধ দর্শন ও সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনতাত্ত্বিক বিনয়সমূহকে হৃদয়ঙ্গম করে, পরিবেশের সাথে সংগতিপূর্ণ, যথাসাধ্য সহজ ভাষায় এবং উপমা ও উৎপ্রেক্ষা যোগে বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি শুধু গ্রন্থনা ও রচনা নিয়ে স্থবির হয়ে থাকেন নি আলোচনায়, দেশনায়, বাগ্মীতায়, যুক্তি প্রায়োগিকতায় তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতার স্বাক্ষর রাখলেন। এ সময় অশ্বঘোষের ব্যক্তিত্বেও ব্যাপ্তি ও খ্যাতির প্রসার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। মূলত তাঁর সাহিত্যের জন্যেই তাঁর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলো।[৩১] এখানে দশ বছর অতিক্রান্ত করার পর তাঁকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হলো। কুশান সাম্রাজ্যে।[৩২] কুশান সম্রাট কণিষ্ক তাঁকে রাজকবি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। সাকেত ও পাটলিপুত্রে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা ও অধ্যয়নের ফলে যে অমিত জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা নানাভাবে বিকশিত হয়েছিলো কুশান সাম্রাজ্যে। তিনি বেশির ভাগ গ্রন্থই রচনা করেছিলেন এখানে বসে।

৭. অশ্বঘোষের দীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

উর্বশী বিয়োগ[৩৩] নাটগ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ কোশল রাজ্যের যবন এলাকায় নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নাটকের নায়িকা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী প্রভার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে না পেরে স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের সারতত্ত্ব অন্বেষণে ব্রতী হয়ে সাকেতের 'বলাকারাম বিহারের' প্রধান পুরোহিত শ্রীমৎ ধর্মসেন মহাস্থবিরের কাছে গিয়ে তিনি প্রব্রজিত[৩৪] গ্রহণ করলেন। এ ব্যাপারে তিনি বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর কাকা ভিক্ষু শুভগুপ্তকে দেখে। তিনি বৌদ্ধধর্মের উদার নীতির প্রতি আকৃষ্ট বহু আগে ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধভিক্ষু পদে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেছিলেন। তিনি সাকেতের "বলকারাম বিহারে" সহ-প্রধান আবাসিক ভিক্ষু ছিলেন।[৩৫] অশ্বঘোষ প্রব্রজিত হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবন শুরু করেন বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে গভীর গবেষণার মধ্য দিয়ে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে জিজ্ঞাসু হয়ে উপাধ্যায়ের সম্মতিতে মগধের পাটলিপুত্র যান। তখন পাটলিপুত্র বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনতত্ব গবেষণার প্রাণকেন্দ্র ছিলো।[৩৬] কারণ ঐ সময় যুগের পরিবর্তনে ও পারিপার্শিক কারণে পাটলিপুত্রে প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিবর্তে নব সংস্কার প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষারই প্রাধান্য ছিলো বেশি।[৩৭]

৮. অশ্বঘোষের ভাষা

অশ্বঘোষ তাঁর সকল কাব্য, নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন একমাত্র সংস্কৃত ভাষাতেই। নাটকে তিনি অনেক দাস-দাসীর চরিত্রকে যথাযোগ্যভাবে প্রতিভাত করার জন্য যেখানে তিনি শৌরসেনী, মাগধি ও প্রাকৃত ভাষারও আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মূল রচনা মাধ্যম হলো সংস্কৃত বুদ্ধচরিত্র কাব্যের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় ড. মুরারি মোহন সেন লিখেছেন:

"অশ্বঘোষ ভাষা প্রিয় কবি ছিলেন; তার ভাষার জন্যেই (ভাবের জন্য নয়) নাকি তিনি মধ্যযুগকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। আধুনিক কালের পাঠকের কাছে তিনি প্রিয়-তাঁর কবি ভাবনার জন্য ভাষা তার ভাবের অধীন।"[৩৮]

আবার মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে অশ্বঘোষের ভাষাতে সামান্য ব্যাকরণগত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও এটি একটি পরিশুদ্ধ কাব্য ভাষা। প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আকর সাহিত্যের

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অশ্বঘোষের ভাষাকে আখ্যায়িত করেছেন "বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা" নামে। অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন সুকুমার সেন।[৩৯] প্রাচ্যের গবেষক Prof. T.W. Rhays Davids অশ্বঘোষের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষাকে সৌষ্ঠবমণ্ডিত পরিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪০]

সুতরাং প্রাকৃত-পালি-শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও সংস্কৃত সমভিব্যাহারে চলমান সময়ে অশ্বঘোষ বহুল প্রচলিত সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করলেন। বিশেষ করে নাটকের চরিত্রের প্রয়োজনে তিনি শৌরসেনী, প্রাকৃত ও অর্ধমাগধিও ব্যবহার করেছেন। এতে তাঁর রচনা কোনো মিশ্রণদোষে দুষ্ট হয় নি। এটি তাঁর ভাষা জ্ঞান সচেতনারই ফল। যথাস্থানে যথাযথ ভাষা ব্যবহারে তাঁর রচনা গুরুত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর কবি দক্ষতার পরিস্ফুটন ঘটেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের ফলেই হয়ত তাঁর এই দক্ষতার উদ্ভব হয়েছিলো।

৯. অশ্বঘোষের সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান

সৌন্দননন্দ[৪১] কাব্য মতে, অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। উপর্যুক্ত গ্রন্থের শেষে লেখা পরিচিতিতে উল্লেখ আছে যে, ঋগ্বেদ ও উপনিষদ সম্পর্কে অশ্বঘোষের জ্ঞান-গভীরতা ছিলো অকল্পনীয়। এখানে তিনি নিজেকে একজন মহান ও সোচ্চার কবি হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এতদ্সঙ্গে নিজেকে একজন সন্যাসী ও বিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবেও বর্ণনা করেছেন। Encyclopedia of Buddhism[৪২] গ্রন্থে মতে, সর্বাস্তিবাদ শাখার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ বিদ্যাবদানও অশ্বঘোষের অজানা ছিলো না। The Buddhacarit or The Acts of the Buddha[৪৩] গ্রন্থে মতে, প্রাচীন গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণও অশ্বঘোষের অধীত ছিলো এবং কোথাও কোথাও উদাহরণ হিসেবে এ গ্রন্থের তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। মহাকবিনাশ্বঘোষেণ রচিতম্ বুদ্ধচরিতম্[৪৪] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ বেদ, সাংখ্য, বেদান্ত যোগ, মীমাংসায় অপরিমেয় পাণ্ডিত্য তাঁর সাহিত্যকৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। তাছাড়া পালি সাহিত্যের ইতিহাস[৪৫] গ্রন্থ মতে, তিনি বুদ্ধচরিতম্ কাব্য গ্রন্থটিও সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এটাই সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধের জীবন-চরিত। বুদ্ধ-চরিতের ভাষায় পাণিনিকে পুরোপুরি অনুসরণ না করলেও এতে ব্যাকরণগত কোন ত্রুটি নাই। এটাই বিশুদ্ধ সংস্কৃতের লেখা। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার[৪৬] গ্রন্থ মতে, সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগীদের মতে অশ্বঘোষ: ছিলেন

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃত সাহিত্যের শীর্ষ কবি ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। মহাকবি অশ্বঘোষ বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত[৪৭] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ প্রভার ধর্মকেই গ্রহণ করে পাটলিপুত্রের অশোকারামে চলে আসেন তখন পাটলিপুত্র, মগধ, সাকেত প্রভৃতি স্থানে সর্বাস্থিবাদ এবং প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য প্রকাশ পাচ্ছিলো। অর্থাৎ, ঐ সময়কার আমলে অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করার কারণেই পরিবারের রীতি অনুযায়ী তিনি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায়।

১০. অশ্বঘোষের বর্ণভেদ প্রথা

পালি সাহিত্যের ইতিহাস[৪৮] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ বর্ণ প্রথার ঘোর বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি সকল মানুষকে তাঁর কর্ম অনুযায়ী বিবেচনা করার কথা বলেছেন। বর্ণভেদ প্রথা সম্পর্কে তিনি কর্মের দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় অথবা জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। তিনি উহার বক্তব্য পাঠকের কাছে পরিপুষ্ঠ করার জন্য বেদ, উপনিষদ, মহাভারত ও মানবধর্ম কথা হতে পদ্য বা গদাংশ উদ্ধৃতি করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এতে উল্লেখ আছে যে, কেউ জাতির দ্বারা ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। যারা দুষ্কার্যে রত হন না, নিঃস্বার্থ, অনাসক্ত, রজমুক্ত, লোভ, দ্বেষ, ও মোহবিহীন, যাদের সংসারের প্রতি কোন আকর্ষণ নাই তারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেরা বন্ধনমুক্ত, কৃতকৃত্য, অনাস্রব, কামচিন্তা ও অহংকারবিহীন হন। তাঁরা ধ্যানী, এককবিহারী, সমর্থ বিদর্শন, ধ্যানলোভী, ক্লেশকাম ও বস্তুকামকে দূরীভূত করেন। এখানে বলা হয়েছে শূদ্রেরা কেবল ব্রাহ্মণের সেবা করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু অশ্বঘোষ উপর্যুক্ত বক্তব্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেন, শূদ্রেরাও সৎকার্য করলে ব্রাহ্মণের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। তিনি প্রাচীন ঋষিদের উক্তিসমূহ উদ্ধৃতি করে বলেন যে, কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা যে কোনো কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে। The Vajrasuci of Asvagosa[৪৯] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ মনে করেন যে, আচার-অনুষ্ঠান, ব্রত, আত্মত্যাগের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। বংশ গৌরব অথবা উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করলে শীলগুণে বিভূষিত না হয়ে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না। বহু লোক নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করে আচার-গোচর সম্পন্ন হয়ে পরিশ্রমের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ ও স্বর্গে গমন করতে পারে। Tevijja Sutta[৫০] মতে, মানুষ জাতি হিসেবে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের

Dhaka University Institutional Repository

পদচিহ্ন এক রূপ; হস্তী, অশ্ব, বাঘ, দীপি প্রভৃতি প্রাণীদের মতো তেমন কোনো পার্থক্য নাই, প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, বর্ণ, শারীরিক গঠন, লোম, চক্ষু প্রভৃতিতে যেমন পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে তেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কাণ্ড ও বাকলের মধ্যে যেরূপ পার্থক্য আছে, মানুষে সেরূপ পার্থক্য নাই। জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, বুদ্ধিমত্তা, বিচার-শক্তি, আচার-ব্যবহারে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতিতে কোনো প্রভেদ নাই। পালি সাহিত্যের ইতিহাস[৫১] গ্রন্থ মতে, অশ্বঘোষ মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির বৈশ্যমপায়নের উপখ্যান উল্লেখ করে বলেন যে, ব্রাহ্মণের নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ থাকা দরকার-১) ব্রাহ্মণ পরদ্রব্য গ্রহণে বিরত থাকবেন। ২) ব্রাহ্মণকে ক্ষমা, ধৈর্য প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হবে। ৩) তিনি কারো প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করেন না। সর্বদা সকলের প্রতি সদয় হন এবং সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে অবিচলিত থাকেন। ৪) তিনি সত্যবাদী, অনাসক্ত ও বন্ধনহীন। এভাবে তিনি ব্রাহ্মণের গুণাবলী তুলে ধরেন। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এর কারণ হিসেবে ধারণা করা হয় তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়ে কৌশল রাজ্যের নীচু বর্ণের যবন পরিবারের মেয়ের সাথে সম্পর্ক করতে না পারার কারণে অশ্বঘোষ তীব্র বর্ণভেদ প্রথার বিরোধী হয়ে উঠেন।

১১. অশ্বঘোষের বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত

মহাকবি অশ্বঘোষ: অশ্বঘোষের বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত[৫২] গ্রন্থ মতে, সাকেত নগরীতে অশ্বঘোষের পরিবার ছিলো উচুঁ ব্রাহ্মণ পরিবার। তখন উজ্জয়িনী, দশপুর, সম্পারক, ভরুকচ্ছ, শালকা (শিয়ালকোট), তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র ইত্যাদি মহানগরীতে প্রচুরসংখ্যক যবন বসবাস করতো। দীর্ঘদিন ধরে বসবাসের ফলে তারা প্রায়ই ভারতীয়ই হয়ে গিয়েছিলো। এমনই এক যবন পরিবারের মেয়ে প্রভা, পিতার নাম দত্তমিত্র। যবন নাট্যশালায় প্রভার সাথে অশ্বঘোষের পরিচয় ঘটে। অশ্বঘোষ প্রথম ভারতীয় নাট্যকার। তিনি যবন নাটক ও নাট্যশালার অভিজ্ঞতা নিয়ে নাটক লেখেন। ঊর্বশীবিয়োগ তাঁর প্রথম নাট্য প্রয়াস। এই নাটকের মধ্য দিয়ে যবনদের সাথে অশ্বঘোষের পরিচয় ঘটে। অবশ্য এর পূর্বে তিনি গান লিখতেন প্রাকৃত ভাষায়। প্রভাকে অশ্বঘোষ ভালবেসেছিলেন। প্রভা ছিলো নাটক ও সঙ্গীতপ্রিয়। প্রভারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলো,

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ। অশ্বঘোষ বৌদ্ধমতের উদার দিক প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রভার সাহায্যে। প্রভা অশ্বঘোষকে মহাস্থবির ধর্মরক্ষিতের নিকট নিয়ে যেতেন। ধর্ম রক্ষিত ছিলেন বিদ্বান ভিক্ষু, জন্ম মিশরের সেকেন্দ্রিয়া নগরে। মিশরেই তিনি ভিক্ষু হন। পরে তিনি এদেশে এসে কালকারাম বিহারে (সাকেত) কালাতিপাত করছিলেন। যবন ও বৌদ্ধদর্শন সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ছিলো। এই বিহারের মহাস্থবির ধর্মসেন অশ্বঘোষের আরেকটি আকর্ষণ ছিলো। ধর্মসেন ছিলেন চণ্ডালপুত্র, কিন্তু কালকারামে তিনি ছিলেন নমস্য ভিক্ষু। জ্ঞানে বুদ্ধিতে সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের এই গ্রহীষ্ণুতা অশ্বঘোষকে আপ্লুত করেছিলো। এখানেই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ভেদভাব-শূন্যতা। তাই দেখা যায়, জাতিচ্যুতির ভয়ে পিতা যখন প্রভার সাথে বিয়ের সম্মতি দিলেন না, যখন প্রভা নিজেকে আত্মবিসর্জন দিলেন সরযুর জলে, তখন অশ্বঘোষ প্রভার ধর্মকেই গ্রহণ করে নিলেন এই কালকারামে। তারপর সেখান থেকে চলে আসেন পাটলিপুত্রের অশোকারামে। পাটলিপুত্র, মগধ, সাকেত প্রভৃতি স্থানে তখন সর্বাস্থিবাদ এবং প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত প্রাধান্য প্রকাশ পাচ্ছিলো।

১২. অশ্বঘোষের সমসাময়িক কবি

অশ্বঘোষের সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষের তেমন কোনো নামোল্লেখযোগ্য সংস্কৃত কবির সন্ধান মেলে না। তবে তাঁর বহু আগে আদিকবি বাল্মীকি ও পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায়। আদিকবি বাল্মীকি তাঁর অমর সাহিত্য কর্ম, বিশেষত "রামায়ণ"-এর জন্য আজও অত্যন্ত সম্মানের সাথে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পতঞ্জলি রাজা পুষ্যমিত্রের (খ্রি. পূ. প্রায় তৃতীয় শতক) পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাহিত্য চর্চার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য আজ লুপ্তপ্রায়। তাই তাঁর নামও বর্তমান সাহিত্য জগতে বিস্মৃতপ্রায়। এই দুজন কবিই ছিলেন অশ্বঘোষের বহু আগের। "সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার" অনুবাদ পর্ষদের প্রধান সম্পাদিক ডঃ মুরারি মোহন সেন ও অধ্যাপক দীপক কুমার বড়ুয়া[৫৩]-এর মতে-অশ্বঘোষ ছিলেন আদি মহাকবি বাল্মীকির যোগ্য উত্তরসুরি এবং কালিদাস ও ভাসের অনুপ্রেরণা উদ্ভাবী পূর্বসুরি। অশ্বঘোষের সমসাময়িক কালের কোনো প্রভাবশালী কবির নাম বা কোনো বিখ্যাত সাহিতকীর্তির সন্ধান মেলে না। তবে কয়েকজন বৌদ্ধ দার্শনিক ছিলেন তাঁর সমসাময়িক কালের। যাঁরা তাঁর সাথে বিভিন্ন সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এক সাথে কাজ করেছেন, এবং তাঁরা নিজেরাও সংস্কৃতি ভাষার বৌদ্ধদর্শন তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করে খ্যতিমান হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলো-আচার্য বসুবন্ধু, নাগার্জুন, পার্শ্ব ও সঙ্গরক্ষ প্রমুখ।[৫৪]

১৩. অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম

বিভিন্ন ঐতিহ্যানুসারে অশ্বঘোষের অসংখ্য রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। Nanjio[৫৫]-এর'Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka' গ্রন্থে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়:

১. বুদ্ধচরতিকাব্য (Buddhaearitakavya)

২. সূত্রালংকারশাস্ত্র (Sutralankarasastra)

৩. মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র (Mahayana Sraddhotpadasastra)

৪. দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র (Dasadustakarmamargasutra)

৫. মহাযানভূমিগুহ্যবাচামূলশাস্ত্র (Mahayanabhumiguhya-vacamulasastra)

চৈনিক ত্রিপিটকে চৈনিক ভাষায় অনূদিত আরও ৬টি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকৃত। জাপানী গবেষক Suzuki[৫৬] উক্ত অনূদিত গ্রন্থগুলোর চৈনিক নামের ইংরেজি ও সংস্কৃত পাঠোদ্ধার করেন। গ্রন্থগুলো যথাক্রমে:

১. Ta-sung-ti-hsuan-wen-pen-lun (A fundamental treatise on the spiritual stats for reaching final deliverance)

২. Ni-kan-tzu-wen-wi-i-ching (A sutra on a Jaina's asking about the theory of non-ego)

৩. Shin-pu-shan-yeh-tao-ching (A sutra on the ten no good deeds)

৪. Lu-tao-lun-hui-ching (A sutra on transmigration through the six states of existence বা ষড়গতিকারিকাহ্)

৫. Lai-cha-huo-lo (A song)

৬. Shi-shih-fa-wu-shin-sung (Fifty verses on the rules of serving a teacher) তিব্বতি [৫৭] ঐতিহ্যে নিম্নলিখিত ১৩টি গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকৃত:

১. শত-পঞ্চশতক-নাম-স্তোত্র (Sata-pancasataka-nama-stotra)

Dhaka University Institutional Repository

২. গণ্ডি-স্তোত্র-গাথা (Gandi-stotra-gatha)

৩. মহাকাল-তন্ত্র-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মাশান-নাম-টিকা(Mahakala-tantra-rudra-kalpa-mahasmasana-namatika)

৪. বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ (Vajrayana-mulapatti-sangraha)

৫. স্থুলাপত্তি (Sthulapatti)

৬. মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র (Manidvipt-mahakarunika-panca- devastotra)

৭. গুরু পঞ্চাশিকা (Guru-Pancasika)

৮. দশ-অকুশল-কর্ম-নির্দেশ (Dasa-akusala-karma-patha-nirdesa)

৯. শোক-বিনোদন (Soka-vinodana)

১০. অষ্টাক্ষণ-কথা (Astaksana-katha)

১১. পরিণামনা-সংগ্রহ (Parinamana-sangraha)

১২. বুদ্ধচরিত-নাম-মহাকাব্য (Buddhacarita-nama-mahakavya)

১৩. বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর (Vajra-sattva-prasnottara)

ভারতীয় এবং অন্যান্য উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকৃতি[৫৮] গ্রন্থসমূহ হলো ১. বুদ্ধচরিত মহাকাব্য, ২. সৌন্দরনন্দম্ কাব্য, ৩. শারিপুত্র প্রকরণ (প্রকরণ জাতীয় নয় অংকবিশিষ্ট নাটক), ৪. রাষ্ট্রপাল (নাট্যগ্রন্থ), ৫. (নাম বিহীন) প্রতীক নাটক, ৬. বজ্রসুচি, ৭. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ৮. সংবৃতি-বোধিচিত্ত-ভাবনোপোদেশবর্ণ (Sanvriti-bodhicitta-bhavanopodesavarnasangraha), ৯. পরমার্থ-বোধিচিত্ত-ভাবনাক্রমবর্ণসংগ্রহ (Paramartha-bodhicitta-bhaanakramavarnasangraha)।

উপর্যুক্ত গ্রন্থগুলো ছাড়াও রত্নাবসু[৫৯] এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া[৬০] 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পমশ পাথর' নামক নাট্যগ্রন্থটিও অশ্বঘোষের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত দু'জন গবেষক গ্রন্থটির সংস্কৃত নাম এবং উক্ত গ্রন্থটি যে অশ্বঘোষের রচনা তা কোন উৎসে উল্লেখিত সে বিষয়ে কোনো তথ্য নির্দেশ করেন নি। তাছাড়া অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করার মতো কোনো প্রমাণও তাঁরা উপস্থাপন করেন নি। তিব্বতি এবং চৈনিক ঐতিহ্যে গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুমন

Dhaka University Institutional Repository

কান্তি বড়ুয়া উৎস উল্লেখ না করলেও অশ্বঘোষ 'উবশী বিয়োগ' নামক একটি নাকটও পরিচালনা করেন বলে তাঁর 'মহাকবি অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি' নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।[৬১] চৈনিতক ঐতিহ্য 'Lai-cha-huo-lo' নামক আধ্যাত্মিক গানটির সুরকার হিসেবেও অশ্বঘোষের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।[৬২] কিন্তু গানটির কোনো সংস্কৃত পুথি বা ভার্সন (Version) পাওয়া যায় না। গানটি সম্পর্কে Law[৬৩]. Its classical, mournful and nelodious music, we are told, induced the citizens of Pataliputra to ponder on the misery and emptiness of life.

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষের গ্রন্থাবলি পর্যালোচনা

অশ্বঘোষের সাাহিত্যকীর্তি কালিদাসের পূর্ব যুগের কাব্য প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য রচনায় তিনি অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তাঁর সমগ্র রচনা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ঐতিহাসিক ও প্রাচীন সাহিত্য গবেষকদের মতে অশ্বঘোষের রচিত যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো- (১)বুদ্ধচরিত (২) সৌন্দরনন্দ কাব্য (৩) শারিপুত্র প্রকরণ-এ তিনটি গ্রন্থ অভিসংবাদিত তাঁর রচনা। এছাড়াও যে সকল রচনা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য ও সন্দেহ রয়েছে তা হলো গণ্ডীস্তোত্র গাথা, বজ্রসূচি ও সূত্রালংকার, মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ সূত্র, সহযান, জাতকমালা, প্রতীক নাটক, শতপঞ্চশকনামস্তোত্র ষড়গতিকাবিকাহ্ কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয় ঊর্বশী বিয়োগ, কল্পনামণ্ডিতিকা, মাতৃচেতার রচনাবলি। অশ্বঘোষের রচনার যেগুলোর খণ্ডিতাংশ পাওয়া গেছে সেগুলোর মধ্যে আছে অসম্পূর্ণ নাটক- ‘খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর’, দুষ্প্রাপ্য প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে ‘রাষ্ট্রপাল নাটক, প্রভৃতি। তারানাথের মতে, ‘মহাযান অষ্টবিঘ্নকথা, দশকুশল কর্মপথ নির্দেশ, দশদুষ্ট কর্মমার্গসূত্র প্রভৃতি নামে তাঁর দর্শন বিষয়ে গ্রন্থ ছিলো।

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মসমূহের পরিচয়ে মহাযান দর্শনের ভিত্তিতে রচিত গ্রন্থগুলো এককভাবে অশ্বঘোষের নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রাচ্যের পণ্ডিত ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সাহিত্যের গবেষক Dr. F.W. Thomas-এর মতে, সূত্রালংকার গ্রন্থটি ছাড়া আবিষ্কৃত অন্য পাঁচটি গ্রন্থ নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের রচনা।[৬৪] নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পকে আলোচনা করা হলো:

১. বুদ্ধচরিত

বুদ্ধচরিত এর সংস্কৃত নাম বুদ্ধচরিতম্। বুদ্ধচরিত কালিদাস পূর্ব যুগের বলিষ্ঠ কবি অশ্বঘোষের একটি প্রাচীনতম সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। বুদ্ধচরিত একটি সংস্কৃত অলংকারসমৃদ্ধ মহাকাব্য তথাগত বুদ্ধের জীবনকাহিনি ও শিক্ষাপদসমূহ এ গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। এতে বুদ্ধের জন্ম হতে ধর্মচক্র এবং মহাপরিনির্বাণবর্ষ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হয়েছে। অশ্বঘোষ এই কাব্যের প্রথমে ইক্ষাকুবংশ হতে শাক্যবংশ এবং কপিলাবস্তু নগরীর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন, তারপর

Dhaka University Institutional Repository

বোধিসত্ত্বের তুষিত সর্গ হতে আগমন করে মায়াদেবীর গর্ভে প্রবেশ, মায়াদেবীর লুম্বিনী গমন, মহোদেবীর কুক্ষিভেদ করে কুমার সিদ্ধার্থের জন্ম, যশোধরার সাথে শুভ পরিণয়, চারিনিমিত্ত দর্শন, রাহুলের জন্ম, গৃহত্যাগ, কঠোর সাধনা, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, ঋদ্ধি ও অনিত্যতা দর্শন, ধর্মপ্রচার ও অবশেষে পরিনির্বাণ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও প্রথম থেকে চতুর্থ সঙ্গীতি এবং সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ঘটনাবলি বর্ণিত আছে।

তিব্বতি অনুবাদ ও চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (1-tsing) মূল বুদ্ধচরিত ২৮টি স্বর্গে রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে এ গ্রন্থের যে সংস্কৃত পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে তাতে ১৭টি সর্গে বুদ্ধের জন্ম হতে বারানসিতে প্রথম ধর্ম দেশনার কাহিনি বিবৃত হয়েছে। সাহিত্যগবেষক ও সমালোচকদের মতে ১৭টি সর্গের মধ্যে প্রথম ১৩টি বর্গ মূল অর্থাৎ, অশ্বঘোষের রচনা এবং শেষ ৪টি সর্গ পরবর্তীকালে ১৮৩০ সালে ঊনবিংশ শতাব্দীর নেপালি কবি অমৃতানন্দ নামক রচনা কোনো কবি রচনা করে মূলের সঙ্গে সংযোজিত করেন। সংযোজনের শেষে তিনি প্রকাশ করেন, ‘লুপ্ত অংশের জন্য সর্বত্র সন্দান করেছি কিন্তু পাইনি। তখন আমি, অমৃতানন্দ চতুর্দশ পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ- এই চারটি সর্গ রচনা করলাম। এটি কাওয়ালের উদ্ধৃতি।[৬৫] পণ্ডিতদের মতে বুদ্ধচরিত গ্রন্থের রচনাকালে খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী। বুদ্ধচরিত কবির শ্রেষ্ঠতম মহৎ সাহিত্যকর্ম। এটি উৎকৃষ্ট মহাকাব্য গুণে ভূষিত। বিভিন্ন পণ্ডিতগণ এর প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়। অধ্যাপক ই.বি. কাওয়েল ‘বুদ্ধচরিত’ ইংরেজি অনুবাদে বলেছেন, It is an early Sanskrit poem, written in India on the legendary history of Buddha?

ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধচরিত ৪১৪-৪২১ খ্রিস্টাব্দে ধর্মরক্ষ কর্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত হয়। ই.বি. কাওয়ালের ১৮৯০ সালে নেপালে প্রাপ্ত বুদ্ধচরিত পুঁথির প্রতিলিপি হতে ১৮৯৩ সালে মূল বুদ্ধচরিত প্রথম প্রকাশ করেন। ১৯২৬-২৮ খ্রিস্টাব্দে এফ. ওয়েলের বুদ্ধচরিতের তিব্বতি অনুবাদ (অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃত) উদ্ধার করে প্রকাশ করেন। সংস্কৃত বুদ্ধচরিতের কয়েকটি অসম্পূর্ণ সংস্করণ ভারতীয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩৬ সালে ড. ই. এইচ. জনস্টন বুদ্ধচরিতের একখানি উৎকৃষ্ট সংস্করণ সম্পাদন করেন।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বুদ্ধচরিত' পড়ে অশ্বঘোষের কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি ইংরেজি, জার্মান, চীনা, তিব্বতি এবং বাংলা ভাষায় অনূদিত ও অনুবাধ হয়েছিলো।[৬৭]

২. সৌন্দরনন্দ

সৌন্দরনন্দ অশ্বঘোষের দ্বিতীয় মহাকাব্য। এ কাব্যের সংস্কৃত নাম 'সৌন্দরনন্দম'। এ গ্রন্থের নামকরণ দেখা যায় যায় কোথাও সৌন্দরনন্দ আবার কোথাও সুন্দরনন্দ। এটি অশ্বঘোষের অসাধারণ কাব্য কীর্তি। অষ্টাদশ সর্গে রচিত এ কাব্যটিতে বুদ্ধের জীবনেতিহাস, শিক্ষা দর্শন ও উপদেশ বাণী বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দর তাঁর স্ত্রী সুন্দরীর প্রণয় কাহিনি, নন্দের নান্দনিক জীবন ও নন্দের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা। বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের অপূর্ব দেহাবয়ব ও রূপলাবণ্যের অধিকারী হয়ে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী অপেক্ষা অতি পরমাসুন্দরী দেবরাণী অপ্সরা দর্শন করান। কাব্যটিতে অশ্বঘোষ অপেক্ষা ধর্মপ্রচারক অশ্বঘোষের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রথম ৬টি সর্গে কলিপাবস্তু নগরীর কথা, বুদ্ধ ও নন্দের জন্ম বিবরণ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ, সুন্দরীর প্রতি আক্ষেপ, বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ও শিক্ষার কথা গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি ও উপমার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে।

এর কাব্যশৈলী, শব্দবিন্যাস, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগ এবং ভাষার নৈপুণ্যে অতুলনীয় এ কাব্যটি বিষয়বস্তু গুণে অত্যধিক মনোহারী ও চিত্তাকর্ষক। এতে কাব্যরীতির মাধ্যমে বৌদ্ধতত্ত্ব ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। এতে উক্ত হয়েছে-জগতের সবাই আসক্তিতে আনন্দ পায়, অস্তিত্বের বিনাশে যে আনন্দ, তা এখানে দুর্লভ। পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি মুর্খদের ভীতির কারণ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপাল হতে সৌন্দরনন্দ কাব্যটি আবিষ্কার করে সম্পাদন করেন। ১৯১০ সালে এশিয়াটিক হতে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ১৯২৮ সালে E.H Johnston পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজী অনুবাদসহ গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।[৬৮]

Dhaka University Institutional Repository

৩. শারিপুত্র প্রকরণ

গ্রন্থটি অশ্বঘোষ রচিত নয় অংকের একটি নাটক। এ গ্রন্থটি ভারবর্ষের নাট্যকীর্তির প্রথম নিদর্শন। নাটকটি সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মিশ্র ভাষায় রচিত হয়েছে। এর প্রাকৃত ভাষা আদি প্রাকৃত।[৬৯] এটি অত্যন্ত প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ নাটকটির বিষয়বস্তু হলো বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য শারিপুত্র ও মৌদ্গলায়নের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। মূল প্রতিপাদ্য বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতির দর্শনভিত্তিক ব্যাখ্যা এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও সমাজচিত্র। এর কাহিনিগুলো বিনয় মহাবর্গেও অনুরূপ। ১৯১১ খ্রি. মধ্য এশিয়া হতে হাতে লেখা তালপত্রের পুঁথিতে অধ্যাপক ড. এইচ. লুডার্স। (Dr. H. Luders) এ নাটকটি আবিষ্কার করেন। নাটকটিতে সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষের নাম উল্লেখ আছে। শারিপুত্র প্রকরণের নয় অংকের সামান্য অংশ মাত্র পাওয়া যায় এবং অঙ্কগুলোর কোনো স্বতন্ত্র নামকরণ নেই। আবিষ্কৃত পুঁথিতে গ্রন্থটির পূর্ণ নাম শারদ্বতীপুত্রকরণ' হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭০]

৪. গণ্ডীস্তোত্র গাথা

স্রগধারা (Sragdhara) ছন্দবৃত্তে গাথাকারে ২৯টি শ্লোকে রচিত একটি গীতিকাব্য। সংস্কৃত গণ্ডী ও স্তোত্র বা ঘণ্টি থেকে গণ্ডীস্তোত্রগাথা। বৌদ্ধ বিহারগুলোতে এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাখা হতো, তার নাম গণ্ডী। এই গণ্ডীতে কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা আঘাত করলে যে মনোহর শব্দের সৃষ্টি হয় তারই ধর্মগত ব্যাখ্যা ও প্রশংসা হচ্ছে 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা'। ধর্মীয় বাণী, মানবজীবন ও পার্থিব পদার্থসমূহের অনিত্যতা বিয়ষক গাথা নিয়ে এ কাব্য সংকলিত। বিষয়বস্তুর ও রচনাশৈলীতে গণ্ডীস্তোত্র মহাবাদিন অশ্বাঘোষের একটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থে মহাকবি অশ্বঘোষের দর্শনতাত্ত্বিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে বুদ্ধের গুণাবলো, বৌদ্ধ বিহারে গমনাগমন এবং বিহারের ঘণ্টাধ্বণি শ্রবণ প্রভৃতির সুফল বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ১৯১৩ সালে St.Peters Bargh থেকে Bibilotheea Buddhist Serise- এ সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। Bunjiu Nanjio এ Catalogue of Chinese Tripitaka-এ এই গ্রন্থকে গণ্ডি (কা) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থের চৈনিক নামকরণ হচ্ছে Chien- ch-ui-fan-tasn। তবে এ গ্রন্থেও তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া যায়। A Von Stael Holstein গণ্ডীস্তোত্র গাথার চৈনিক অনুবাদকে ভিত্তি করে সংস্কৃতে মূল গ্রন্থটি পুনর্গঠন করেছেন।[৭১]

এ গ্রন্থের মর্মবাণী দিয়ে বিশেষ উপায়ে মানুষের মনের ধর্মেও মূলকথাগুলো পৌঁছে দেয়া হয়। প্রকৃত অর্থে এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বুদ্ধ ও বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এ গ্রন্থের কুড়িটি শ্লোকে একদা কাশ্মীরের দুঃসাহনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তবে এর রচনাশৈলীতে অশ্বঘোষের রচনাবলির বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় না।

বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর বিচারে M. Winternitz গ্রন্থটি অশ্বঘোষের অপূর্ব রচনা বলে মনে করেন। Johnston রচনাশৈলীর দিক থেকে গ্রন্থটি বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং হীনযান ভাবাদর্শের পরবর্তীকালের রচনা। অশ্বঘোষের স্বীকৃত তিনটি গ্রন্থে হীনযান ভাবাদর্শের কর্মবাদ এবং কার্যকারণ তত্ত্বের আলোকে বা যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের মহিমা তুলে ধরা হলেও গণ্ডীস্তোত্র গাথায় উল্লেখিত তত্ত্বের বিপরীতে ভক্তিবাদ স্থান পেয়েছে। ফলে গ্রন্থটি মহাযানী ভাবাদশে রচিত বলা যায়।[৭২]

৫. সূত্রালংকার

সর্বাস্তিবাদী ঐতিহ্য মতে, সূত্রালংকার বা মহাসূত্রালংকার শাস্ত্র রচয়িতা বোধিসত্ত্ব অশ্বষোঘ, যিনি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনশত বৎসর পর জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থটি ৪০৫ খ্রিস্টাব্দে কুমারজীব চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০৮ সালে Huber চৈনিক ভাষা হতে গ্রন্থটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। Heinrich Luders গ্রন্থটি সংস্কৃত পুঁথির খণ্ডাংশ আবিষ্কার করেন। Colophoin আবিষ্কাত পুঁথির এ গ্রন্থটির নাম কল্পনামণ্ডিতিকা ও কল্পনালংকৃতিকা এবং এর রচয়িতা কুমারলাত হিসেবে উল্লেখ করেন।[৭৩] এটি সর্বাস্তিবাদের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং এর ভাষা শুদ্ধ সংস্কৃত। এতে রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন লিপি ও শিল্পচিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। কল্পনামণ্ডিতিকা গদ্যে ও মহাকাব্যে রীতিতে পদ্যে রচিত এবং জাতক ও অবদানের মতো ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

কাহিনির সংকলন। এর কিছু কাহিনিতে মহাযান ভাবধারায়, বিশেষত মহাযান বুদ্ধভক্তি প্রকাশ পেয়েছে।[৭৪]

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়াসহ অনেকে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা নয় বলেও মত দিয়েছেন। Nariman এর মতে, গ্রন্থটি বুদ্ধচরিতের অনেক পরবর্তীতে রচিত। এতে বুদ্ধচরিত মহাকাব্য ও সম্রাট কণিষ্কের উল্লেখ আছে। এ হিসেবে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের শেষজীবনের রচনা। অবশ্য Luders এব Levi মনে করেন 'অশ্বঘোষ সুত্রালংকার গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।'[৭৫]

৬. বজ্রসূচী

প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক ও ধর্ম সংস্কারের প্রেক্ষাপট নিয়ে রচিত একটি ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ। অশ্বঘোষের রচিত অমূল্য ক্ষুদ্র গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয়ের সংক্ষেপ হিসেবে চারিবেদ, মহাভারত ও মনুর ধর্মশ্রাস্ত্র হতে উদ্ধৃতি সহযোগে ব্রাহ্মণ্য জাতিবাদ তথা ব্রাহ্মণের স্বরূপ, কর্মবাদ প্রভৃতি প্রতিভাত হয়েছে।[৭৬]

৭. জাতকমালা

সাহিত্য মতে জাতকমালার রচয়িতা আর্যশূর বা শূর।[৭৭] তিব্বতী ঐতিহাসিক লামা তারানাথসহ অনেকের মতে, আর্যশূর অশ্বঘোষেরই নামান্তর। এটি পালি জাতকসমূহ ও চরিয়া পিটক থেকে সংগৃহীত ৩৪টি কাহিনি। এতে বহু কবি সংস্কৃত গদ্য ও গদ্য-পদ্যে অনুবাদ করা হয়েছে। ধর্মালোচনার মধ্যে মধ্যে দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যই এ কাহিনিগুলো এক সময়ে একত্রে সন্নিবেশিত হয়ে। অশ্বঘোষের রচনাশৈলী ও ভাষায় প্রভাব এতে বিদ্যমান। জাতকামালা গ্রন্থে চরিয়া পিটকের মতো বোধিসত্ত্বের পারমিতা সাধনা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাস মতে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে আর্যশূরের আবির্ভাবকাল বলে মনে করা হয়। রচনারীতিতে জাতকমালা হুবহু কল্পনামণ্ডিতিকার মতো। আর্যশূর নতুন কাহিনি উদ্ভাবন না করে পুরাতন কাহিনিকে ভিত্তি করে সহজ-সরল সাবলীল ভাষা ও শিল্প নৈপুণ্যের মাধ্যমে কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। ইৎ-সিং জাতকামালায় জনপ্রিয় কাহিনিগুলো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। চৈনিক ত্রিপিটকে আর্যশূর রচিত জাতকামালায় মাত্র ১৪টি কাহিনি সন্নিবিষ্ট আছে।[৭৮]

৮. মাতৃচেতের রচনাবলি

Dhaka University Institutional Repository

তিব্বতে মাতৃচেতের কবিতাগুলো অশ্বঘোষের রচনা বলে মনে করা হয়। লামা তারানাথের মতে, মাতৃচেত অশ্বঘোষের অন্য একটি নাম। অনেকে মাতৃচেত অশ্বঘোষের বয়োজ্যেষ্ঠ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কবি বলে মনে করেন। কথিত আছে সম্রাট কণিষ্ক মাতৃচেতকে রাজসভায় আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইৎ-সিং, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, কবি মাতৃচেতের উদ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ইৎ-সিং-এর মতে ভারত পর্যটনকালে মাতৃচেত একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন এবং তাঁর বুদ্ধ প্রশাস্তি দূর-দূরান্তে গাওয়া হতো। মাতৃচেত রচিত অপর দু'টি স্তোত্রের নাম চতুঃশতক স্তোত্র ও শকপঞ্চাশতিকা স্তোত্র। এ দু'টি স্তোত্রের পাণ্ডুলিপির খণ্ডিতাংশ মধ্য এশিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতি ভাষায় একটি স্তোত্র অনূদিত হয়েছে এবং ইৎ-সিং শতপঞ্চাশতিকা চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন।[৭৯] এছাড়াও তার অন্যান্য গন্থগুলোর নাম নিম্নে দেওয়া হলো: প্রতীক নাটক , রাষ্ট্রপাল নাকট, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ষড়গতিকারিকাহ (La-too-fun-hui-ching) প্রভৃতি

উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, অশ্বঘোষ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী এবং পিতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তিনি সাকেতে জন্ম গ্রহণ করেন যা বর্তমানে ভারতের অযোধ্যা নামক অঞ্চলে অবস্থিত। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ভিক্ষুর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তিনি বাল্যকালে বেদ অধ্যয়ন করেন। তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি অনত্য ও অনাতত্য বিষয়ে প্রজ্ঞা বা জ্ঞান লাভ করে নানা সাহিত্যকর্মে সেগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। এবং তাঁর সাহিত্য কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা যথাযথভাবে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধচরিতম্, কলিকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, ২০০৮ পৃ. ১১।

২. শ্রী বিমলাচরণ লাহা, সৌন্দরনন্দ কাব্য, কোলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৩, পৃ. মুখবন্ধ খ।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১।

৪. জগন্নাথ বড়ুয়া, মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ৮২।

৫. ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৭, পৃ. ১৯১।

৬. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৩৩৮।

৭. অধ্যাপক শ্রীমণিন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ), কলিকাতা: ধর্ম্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, ১৩৬৩, পৃ. ভূমিকা ২।

৮. ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা, কলিকাতা: গোস্বামী প্রকাশনী, ১৯৭৭, পৃ. ২৭।

৯. বিমল চন্দ্র দত্ত, বৌদ্ধ ভারত, কলিকাতা: রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এন্ড কালচার, পৃ. ৩৪।

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৫৬০।

১১. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮৯২।

১২. প্রগুপ্ত, মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, পৃ. ৭৪।

১৩. C/O S. Levin in J. A. 1896, S.I. T. VIII, P. 447f.

Dhaka University Institutional Repository

১৪. ডক্টর রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০, পৃ. ৩৬৮।

১৫. সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, ৯নং খণ্ড, কবি পরিচিতি পর্ব, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, কোলকাতা।

১৬. Hinen-tsiang calls 'Ashvaghosha, Deva. Nagarijuna and Kumarlabha-the four suns which illuminate the world', (ed. F. Max. Mullar Sacred Books of the East. Vol-49. P.9.)

১৭. এটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকৃত। এখনো এটি অনাবিষ্কৃত রয়েছে। জার্মান পণ্ডিত বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ হেনরিচ ল্যুডার্স (H. Lueders) বিভিন্ন উৎস হতে এর কিছু খণ্ডিতাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৮. বসন্তস্নান-বসন্তকালে তরুণ তরুণীদের মধ্যে সাঁতার প্রতিযোগিতার একটি উৎসব। সাকেতের সরযু নদীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। তখনকার দিনে এই প্রতিযোগিতা মহোৎসবের চেয়ে আর কোন বড় উৎসব হতো না। প্রতি বছর এই উৎসবের ভিতর দিয়ে কতজনেই না স্বয়ম্বরা হয়ে উঠতো। বাবা-মায়েরা এই বিষয়ে তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিত করতেন। নগ্নদেহে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করাই ছিলো রীতি। তখনকার দিনে এটিই ছিলো সর্বজন মান্য শিষ্টাচার-(রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভোল্গা থেকে গঙ্গা, প্রকাশকঃ চিরায়ত প্রকাশনী, কোলকাতা, পৃ. ১৪৪)।

১৯. বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষিত হওয়া।

২০. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভোল্গা থেকে গঙ্গা, প্রকাশকঃ চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ১৫৯।

২১. সম্পাদক মুরালি মোহন সেন, সৌন্দরনন্দ, ৯ম খণ্ড, সংস্কৃত ভাণ্ডার, ভূমিকা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০, কলিকাতা।

২২. সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর কোশলরাজ্যের রাজধানী। কোশলরাজ প্রসেনজিতের একটি রাজপ্রসাদ ছিল। সাকেত পূর্ব (প্রাচী) থেকে উত্তরে (পাঞ্জাব) যোগাযোগ পথে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত থাকায় জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্যেল এক বড় কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ ও ৮ ক্রোশ প্রস্থ ছিল। ভারতের অযোধ্যা নগরী

২৩. আর্য-ঋষি, বিদ্বান, সদ্বংশজাত ইত্যাদি। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য তথা শিক্ষা সংস্কৃতির বিস্তার কল্পে মধ্য এশিয়া হতে ভারতবর্ষে আগত জনসাধাণকেও আর্য বলা হয়। এই আর্যরা কাশপিয়াণ হ্রদের নিকটবর্তী একস্থানে বসত স্থাপন করেন। এই অঞ্চলকে বা হয় 'আর্যব্রত'। (বঙ্গীয় শব্দকোশ, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, সাহিত্য আকাদেমী, কোলকাতা)।

২৪. আর্য-মহাকাব্য ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১২ নং শোকে বলা হয়েছে- 'ব্রাহ্মণোহস্য মুখসামীদ্বাহ্' অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ। মনুসংহিতায় ১ম অধ্যায়ের ৮৮নং শ্লোকে ব্রাহ্মণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলেছেন-

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার পবিত্রতম মুখ থেকে উৎপন্ন বলে, সকল বর্ণের আগে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হওয়অয় এবং বেদসমূহ ব্রাহ্মণকর্তৃক রক্ষিত হওয়অর জন্য (বা বেদসমূহ ব্রাহ্মণেরাই পঠন-পাঠন করেন বলে)- ব্রাহ্মণরাই ধর্মের অনুশাসন অনুসারে এই সৃষ্ঠ জগতের একমাত্র প্রভু।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে-"স্বধর্মো ব্রাহ্মণস্যাধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের কর্তব্য হল অধ্যযন বেদাদি পাঠ), অধ্যাপনা (অন্যকে পাঠদান), যজন (স্বহিতার্থে যজ্ঞসম্পাদন), যাজন (পরহিতার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান), দান (অন্যকে দানকর্ম) এবং প্রতিগ্রহ (অন্যের থেকে দানগ্রহণ)।

২৫. Samghaguhya, alias Samghagupta or Simhagupta. Taranath's History of Buddhism in India. p. 132, Motilal Banarsidass, india.

২৬. ঋক্, সাম ও যর্জু-এই তিনটিকে ত্রি-বেদ বলা হয়।

২৭. প্রাগুপ্ত, সৌন্দরনন্দ, ৯ম খণ্ড, ভূমিকা।

২৮. প্রাগুপ্ত, মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, পৃ. ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্মপন্থি।

৩০. ড. রাধারমণ জানা, পালি ভাষা-সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশকঃ পুস্তক বিপনী, কোলকাতা, পৃ. ৫।

৩১. J.K. Nariman, Literary History of Sanskrit Budhism, Publishers: Motilal Banarsidass. India, P. 37.

৩২. কুশান সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করেছিলো সম্রাট কণিষ্কের শাসনামলে। কণিষ্কই অশ্বঘোষকে নিজ সাম্রাজ্য নিয়ে এসেছিলেন। নণিষ্কের রাজত্বকালে কুশান সাম্রাজ্য গান্ধার এবং কাশ্মীর হতে বেনারস পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রকাশকঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কোলকাতা, পৃ. ৪২৯।

৩৩. এটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকৃতি। এখানো এটি অনাবিষ্কৃত রয়েছে। জার্মান পণ্ডিত বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ্ হেনরিচল্যুডার্স (H. Lueders) বিভিন্ন উৎস হতে এর কিছু খণ্ডিতাংশ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন।

৩৪. বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে দীক্ষিত হওয়া।

৩৫. প্রাগুপ্ত, ভোল্গা থেকে গঙ্গা, পৃ. ১৫৯।

৩৬. জাহ্নরী কুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার, প্রকাশক: কলকাতা, ১৩৮৫।

৩৭. প্রাগুপ্ত, পালি ভাসা-সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৫।

৩৮. প্রাগুপ্ত, সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ৯ম খণ্ড, কবি পরিচিতি পর্ব।

৩৯. বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ লেখকের সংস্কৃত ভাষা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' সৌন্দরানন্দ' প্রভৃতি রচনার ভাষা। ২. ললিতবিস্তর, 'বিদ্যবদান', 'অবদানতশতক', সদ্ধর্মপুন্ডরীক প্রভৃতি রচনার গদ্য অংশের ভাষা। ৩. 'মহাবস্তু' এবং ললিতবিস্তর ও সদ্ধর্মপুন্ডরীক এর কাব্যাংশের ভাষা। প্রথম শ্রেণীর ভাষার সঙ্গে পানিণীয় সংস্কৃতের অমিল সমান্য। বেশি অমিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষায়। অল্প-

Dhaka University Institutional Repository

স্বল্প ব্যাকরন-দুষ্ট ও উপভাষাগত প্রয়োগ ও মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রীতি অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাকেই যথার্থ বৌদ্ধ সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণভাবে একে একদা বলা হতো "গাথা ভাষা" এখন বলা হয় মিশ্রসংস্কৃত। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ সংস্কৃতে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া আদি ভারতীয় আর্যভাষার ব্যাক্‌রীতির অনেক ছাঁট-ছোট ও নব্য ভারতীয় আর্যভাষার বাগধারার অনেক নবাঙ্কুর এতে স্বীকৃত হয়েছে।- হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭।

৪০. An outline syntax of Buddhistic Snaskrit-Sukumar Sen-Journal of the Department of Letters. Vol. XVII Calcatta University Press. 1928.

৪১. প্রাগুপ্ত, সৌন্দরনন্দ, ৯ম খণ্ড।

৪২. Encyclopaedia of Buddhism, ed. G.P. Malalasekera, Vol-II, Fascicle-2, 1967, Colombo, P. 293.

৪৩. The Buddhacarit or The Acts of the Buddha-Part-II, E.H. Johnston, Delhi, 1987, P-XIV (Introduction).

৪৪. ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, মহাকবিনাশ্বঘোষেণ রচিতম্ বুদ্ধচরিতম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮, পৃ: ১১।

৪৫. প্রাগুপ্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।

৪৬. সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১১ নং খণ্ড, প্রকাশক: নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ভূমিকা, পৃ: ৪।

৪৭. অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোষ: বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩, পৃ. ১০।

৪৮. প্রাগুপ্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭২।

৪৯. Professor Sujit Kumar Mukhopadhaya, The Vajrasuci of Asvaghosa published by Sino Indian. Cultural Society Santiniketan, India, V. 30.

৫০. পালি সুক্তনিপাতে (মহাবগ্‌গ) 'বাসেট্‌ঠ সুত্তে' অনুরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। See Nos. 5.6.7.8.9.10.11; Digha, I, Tevijja Sutta, Majjhima, 11p. 98.

৫১. প্রাগুপ্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

Dhaka University Institutional Repository

৫২. প্রাগুপ্ত, মহাকবি অশ্বঘোষ:ধ বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত, পৃ. ১০।

৫৩. A brief note on Asvaghosa. Dipak k. Barua-Maitrey Bance. Bangladesh Journal of Buddhist studies. Voll. III. No-1, May. 1980.

৫৪. প্রাগুপ্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস-১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।

৫৫. Bunyin Nanjio, Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, (Oxford University Press, Oxford, 1833), No. 1182, 1249-50, 1299,1351,1379, pp. 44ff.

৫৬. T. Suzuki (tms). Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith, (Chicago, OTF. 1990), pp. 36ff.

৫৭. Debiprasad Chattopadyaya (ed.), Taranatha's History of Buddhism in India, (K.P Bagchi & Company, 1980), pp. 392-393.

৫৮. E.H Johnston, The Buddhacarita of Act of the Buddha (Motill), (Delhi Banarasidaa, 1984), pp. Xii-Xiiv; B.C Law, 'Asvaghosa', Encyclopacdia of Buddhism, (Ceylon: Government Press, 1967), P. 295.

৫৯. রত্নাবসু, শারিপুত্রপ্রকরণ, প্রসূন বসূ (সম্পা,), 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার', নং ১১ (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১), পৃ. ৪

৬০. সুমন কান্তি বড়ুয়া, 'মহাকবি অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকীতি', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৯০২), পৃ. ১১২৮

৬১. প্রাগুক্ত

৬২. T. Suzuki, op, cit, p. 35

৬৩. B.C Law, op, cit, p. 295

৬৪. পূর্বোক্ত, সুমন কান্তি বড়ুয়া পৃ. ১২২

৬৫. মুরারিমোহন সেন, প্রসুন বসু (সম্পা), সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (৯ম খণ্ড), ১৯৮০, পৃ. ১৬

৬৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধচরিত, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ.৫-৬

Dhaka University Institutional Repository

৬৭. বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা থেকে তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রসুন বসু, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, (১১,১৯৮৯ এবং ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১৯৬৩ সালে মুনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বুদ্ধচরিত বাংলায় অনুবাধ করেন।

৬৮. ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫পৃ. ১৯৭

৬৯. পুর্বোক্ত, বৌদ্ধ সাহিত্য, পৃ. ১৯৭

৭০. রত্নাবসু, প্রসুন বসু (সম্পা) শারিপুত্র প্রকরণ, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (১১ খণ্ড), ১৯৮৯ সালে সম্পাদন করেন।

৭১. পূর্বোক্ত, বৌদ্ধসাহিত্য, পৃ. ১৯৮-১৯৯

৭২. ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৮বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ৬৮

৭৩. পূর্বোক্ত ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোসের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা, পৃ. ৭০

৭৪. পূর্বোক্ত, বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, পৃ. ১৯৯

৭৫. পূর্বোক্ত, বৌদ্ধ সাহিত্য, পৃ. ১৯৯

৭৬. পূর্বোক্ত, বৌদ্ধ সাহিত্য, পৃ. ১৯৮

৭৭. পূর্বোক্ত বিনযেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, পৃ. ২০১

৭৮. পালি সাহিত্যের ইতিহাস ড. রবীন্দ্র বিজয বড়ুয়া (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ২০১

৭৯. পূর্বোক্ত, পালি সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ঐহিতাসিক গ্রন্থ হিসেবে বুদ্ধচরিতম্ গ্রন্থের পুনর্মূল্যায়ন

এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে 'বুদ্ধচরিতম্' গ্রন্থের পুনর্মূল্যায়ন। 'বুদ্ধচরিতম্' গ্রন্থের সৃষ্টি না হলে আমরা এর পুনর্মূল্যায়ন করতে পারতাম না। বুদ্ধচরিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য এবং বুদ্ধের জীবন চরিতই এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। তাই আমি মনে করি এ অধ্যায়ের প্রথমে বুদ্ধের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারনা দেওয়া উচিত। বুদ্ধ সমন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি।"[১] রবীন্দ্রনাথের কথা সর্বান্তকরণে মেনে নিলেও বুদ্ধ জীবন কাহিনি, তাঁর দর্শন, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং কালক্রমে এই ধর্মের যে বিবর্তন ঘটেছে তার বর্ণনা করা অতীব কঠিন কাজ। বুদ্ধচরিত্রে যেমন সুমহান আত্মত্যাগ, যেমন প্রগাঢ় করুণা তেমনি অপূর্ব মনীষা:তাঁর দর্শনের গভীরেও এই তিনটি চারিত্রিক মহাগুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর অনন্তগুণ সমাবেশিত জীবনী লেখা যেমন কঠিন কাজ তেমনি তাঁর দর্শনের বিস্তীর্ণতা এবং জটিলতা সাধারণের বোধির পরিধির মধ্যে আনা অত্যন্ত কঠিন। প্রথমেই তার জীবন ইতিহাসের কথা ধরা যাক। কোন মহাপুরুষের জীবনী হলো, তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যকালীন সৎকর্ম এবং সেই কর্মের ফল সমাজ বা গোটা জাতির জীবনে কিভাবে প্রভাবিত করবে তা বিচার বিশ্লেষন করা বিজ্ঞানমনা ঐতিহাসিকের কাজ। কিন্তু কোন মহাপুরুষের মহাপ্রয়ানের পর তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের মধ্যে তাঁর ঋদ্ধিবলের মহত্ব প্রচার বিশেষভাবে জোরদার হয়ে ওঠে এবং কাল পরিক্রমায় অনেক কল্পিত কাহিনি তাঁর জীবনোতিহাসে আরোপ করা হয়। 'বুদ্ধচরিতম্' একটি ঐতিহাসিক প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য। আর ঐতিহাসিক কোন বিষয় নিয়ে যে সমস্ত কাব্য লিখিত হয় তাকে আমরা ঐতিহাসিক কাব্য বলি। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হল, ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে 'বুদ্ধচরিতম্' গ্রন্থের পুর্ণমূল্যায়ন। এখানে 'বুদ্ধচরিতম্' একদিকে যেমন একটি মহাকাব্য হিসেবে পরিচিত তেমনি অন্যদিকে 'বুদ্ধচরিতম্'- এর প্রধান উপজীব্য বিষয় হলো বুদ্ধের জীবনচরিত। তাই আমি

Dhaka University Institutional Repository

মনে করি মহাকাব্য হিসেবে 'বুদ্ধচরিতম্' এর যেমন আলোচনা করা প্রয়োজন তেমনি বুদ্ধের জীবনচরিতও।

মহা+কাব্য= মহাকাব্য। অর্থাৎ, মহা ও কাব্য এই দুয়ের সমন্বয়ে হলো মহাকাব্য। মহাকাব্যের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ও অর্থব্যঞ্জক। সাধারণ একটি গভীর ও সমুন্নত বিষয় নিয়ে আদ্য, মধ্য ও অন্ত সংবলিত দীর্ঘ, বর্ণনাত্মক বীররস সমৃদ্ধ পদ্যে রচিত কাহিনিকে মহাকাব্য বলে। এর ভাষা তেজোদীপ্ত, অলংকারবহুল এবং গাম্ভীর্যব্যঞ্জক। এখানে 'মহা' অর্থ বড়, বিস্তৃত, ব্যাপক, বৃহৎ এবং 'কাব্য' অর্থ স্বর্গ বিশিষ্ট কবিতা বা গাথা। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যাতে স্বর্গ বিশিষ্ট ছন্দের সুদীর্ঘ কবিতা (সুদীর্ঘ কাব্য) বা long poem তাকে মহাকাব্য বলে।

মহাকাব্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো এপিক (epic)। পাশ্চাত্য সাহিত্যের জগতে মহাকাব্য আবার 'এপিক নামে পরিচিত। এই epic শব্দটি গ্রিক 'epos' হতে গৃহীত হয়েছে। epos অর্থ শব্দ বা গান। যার অর্থ শব্দ বা সঙ্গীত। অর্থ প্রসারের ফলে এর অর্থ দাঁড়ায়, বীর্যগাথা বা শৌর্যের কাহিনি। সেই গাথা বা কাহিনির বাঙ্ময় প্রকাশ হলো এপিক বা মহাকাব্য।[২] কালক্রমে আবার এর অর্থ সম্প্রাসারিত হয়ে epos শব্দ-গল্প-গান-বীরত্বগান-বীরগাথা ইত্যাদি হয়েছে। মহাকাব্যের গ্রিক প্রতিশব্দ হচ্ছে epikos।[৩]

প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে সমগ্র জাতির জীবন-চেতনা, তার ঐতিহ্যের এবং ইতিহাসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার রসঘন প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে মহাকাব্যগুলোকে জাতীয়-চেতনা, তার ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার রসঘন প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে মহাকাব্যগুলিকে জাতীয় গৌরবগাথা, বীরত্বের আখ্যান বলা হয়। মহাকাব্য বলতে যে অতিকায় কবিকৃতি বুঝায় এক কথায় তার যথার্থ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত দুরূহ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আদর্শানুসারে মহাকাব্যে সর্গ বিভাগ থাকবে এবং সর্গ সংখ্যা হবে আটের অধিক। সমগ্র সর্গ এক ছন্দে রচিত হবে, তবে সর্গান্তে ছন্দের পরিবর্তন ঘটবে। বিষয়ানুযায়ী সর্গের নামকরণ হবে। আশীর্বাদ, নমস্কার অথবা বস্তুনির্দেশ দ্বারা মহাকাব্য আরম্ভ হবে। এর উপজীব্য বিষয় হবে ধর্মশাস্ত্র, ইতিহাস বা কোনো সত্য ঘটনা। মহাকাব্য পাঠে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ- এই চতুবর্গ ফল লাভ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এরিস্টটলের মতে, মহাকাব্যের শ্রেণী সরল ও জটিল। এর চারটি উপাদান ও ছয়টি অঙ্গ। মহাকাব্যের উপযোগী ছন্দ হলো- শূরছন্দ বা ষটপ্দী। এর দৈর্ঘ্যতা ও চমৎকারিত্ব অনেক বেশি।[৪]

মহাকাব্য শব্দটি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে পরবর্তী এবং গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ', বিশ্বনাথ কবিরাজ (চক্রবর্তী)র 'সাহিত্য দর্পণ' (৬ষ্ঠ অধ্যায়) গ্রন্থের মধ্যে মহাকাব্যের সংজ্ঞা ও বহিরঙ্গ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

বুদ্ধচরিতম্ গ্রন্থটি ভারতীয় সাহিত্য প্রতিভাবন মহাকবি অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ রচনাশৈলী এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভুবনে একটি ঐতিহাসিক কাব্য। এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, মহামানব বুদ্ধের জীবন কাহিনি ও শিক্ষাপদ সমূহ। যেকোন মহাকাব্যে যেমন অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সকল লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে তেমনি 'বুদ্ধচরিতম্' কাব্যটিও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মহাকাব্যের রীতির লক্ষণসমূহ এতে পরিলক্ষিত হয়েছে। রচনাশৈলী, বস্তু নির্দেশ, সর্গ বিন্যাস, ছন্দ, অলংকার উপমা, ভাষা, রূপক, রসবিচার, চরিত্র রূপায়ন, মহাজীবন, কাল, বংশ বর্ণ, আবির্ভাব, মহত্ত্বা প্রভৃতি বুদ্ধচরিত কাব্যে সম্পৃক্ত হয়েছে।

অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিতের (যা অশ্বঘোষের মূল রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়) ১৪টি সর্গে রচিত। ১৪টি সর্গের নাম হলো:

১ম সর্গ ভগবান বুদ্ধের জন্ম, ২য় সর্গ- অন্তঃপুরবিহার, ৩য় সর্গ-উদ্ধেগের উৎপত্তি, ৪র্থ সর্গ-নারী প্রত্যাখ্যান, ৫ম সর্গ-অভি-নিষ্ক্রমণ, ৬ষ্ঠ সর্গ-ছন্দক বিসর্জন, ৭ম সর্গ-তপোবন প্রবেশ, ৮ম সর্গ-অন্তপুর:বিলাপ, ৯ম সর্গ-কুমার অন্বেষণ, ১০ম সর্গ-বিম্বিসারের আগমন, ১১শ সর্গ-কামনিন্দ, ১২শ সর্গ-অরাড় দর্শন, ১৩শ সর্গ-মার বিজয়, এবং ১৪শ সর্গ-বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর সিদ্ধার্থ বা গৌতম বুদ্ধ, শাক্যমুনি (শাক্যবংশীয ঋাষি), তথাগত এবং বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যায়িত হন।[৫]

'বুদ্ধচরিতম' কাব্যের লক্ষণে দেখা যায়, এ কাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের অঙ্গনে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। বিভিন্ন পন্ডিতদের অভিমত বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, তাদের মতে মহাকাব্য প্রাচীন কালের বিশিষ্ট সম্পদ। আধুনিককালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হতে পারেনা। বিশ্ব নন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুর বলেছেন, "মহাকাব্য আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল মাত্র চারটি: 'ইলিয়াড', 'ওডেসি', 'রামাযণ', ও 'মহাভারত'।

অলংকার শাস্ত্রের স্বাভাবিক নিয়ম বাদ দিলে কৃত্রিম আইনের বসেই কালিদাসের 'রঘুবংশ' ভারবির 'কিরাতার্জুন বা মিল্টনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' ভল্‌টেয়ারের 'হাঁড়িয়াড' প্রভৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে জোর করে বসান হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের কবি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীরও এই মত। তাঁর মতামত হলো: 'কালিদাস' ভারবি, মাঘ, অশ্বঘোষ প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য অলংকার শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। উপখ্যানের বাহুল্য থাকে এবং তার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক সর্গের প্রয়োজন হয়। আনন্দবর্ধন এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন, মহাকাব্যকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করলেও ভুল হবেনা। এখানে 'অমৃত' দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে একটি যার মৃত্যু নেই অন্যটি যা পরম রস। মহাকাব্যে যা ছন্দে গাঁথা তা যদি আনন্দের প্রকাশ হয় তবে সে মৃত্যুঞ্জয়ী। আবার মহাকাব্যের ক্ষয় নেই কেননা তার ছন্দে অমৃতমন্ত্র আছে।[৬]

মহাকাব্যের যথার্থ মূল্যনিরূপন হয়ে থাকে রসের বিপুল ভূমিকার কষ্টিপাথরেই। আর সেই রসের রসিক ঐ মহাকাব্যকেই বরমাল্য দিয়ে বরণ করে থাকেন। যার মধ্যে আছে আনন্দ উল্লাসের ও বিশালতার রসোত্তীর্ণ ঐক্য এবং স্থাপত্য শিল্প-শৈলীর চরম উৎকর্ষ।

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বৃহদায়ত মহাকাব্য রামায়ণের দিকে অবলোকন করলে দেখা যায় এর রচয়িতা মহর্ষি বাল্মীকি একদা তমসা নদীর তীরে ভ্রমন অবস্থায় দেখতে পেলেন কোন এক ব্যাধের শরাঘাতে ক্রৌঞ্চযুগলের পুরুষ ক্রৌঞ্চটি নিহত হলো আর স্ত্রী ক্রৌঞ্চটি তার বিরহে করুনভাবে বিলাপ করতে লাগলো। এ করুন দৃশ্য দেখে বাল্মীকি মমার্হত হলেন এবং করুনার আবেগে তাঁর মুখনিসৃত: যে ছন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, সে ছন্দকে ধন্য করার জন্য মহর্ষি নারদ ঋষির নিকট থেকে একজন আদর্শ মানুষের সন্ধান করেছিলেন।

তাইতো বলা যায়, মহাকাব্য মানুষের ইতিহাস, যুগের ইতিহাস, জাতির ইতিহাস, জাতির ঐতিহ্য ও ইতিহাস আর মহাকাব্যের সার্থকতা সেখানেই নিহিতার্থ যেখানে রাসাত্মক বাক্যের মাধ্যমে একটি যুগকে বিধৃত করে তার পরিপূর্ণ পরিচয উদঘাটন করা যায়। সুতরাং উপরের

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা থেকে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে, প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলো কোন একজন মাত্র কবির সম্পত্তি নয়, সেগুলো কোন একটি জাতির সমগ্র সম্পদ। কেননা মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে একটি জাতি বা সভ্যতার বহুকালের সঞ্চীয়মান ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্থায়ী রূপ পেয়ে থাকে। তাইতো মহাকাব্যের প্রধান গুন বিস্তৃতি সর্বতঃ প্রসারীভাব।

পালিসাহিত্য প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের রত্নকোষ হিসেবে পরিচিত। প্রসঙ্গত: এতে বর্ণিত হয়েছে ইতিহাস-ঐহিত্য সমাজ এবং রাজনীতি। পালিসাহিত্য কেবল বৌদ্ধধর্মের রত্নকোষই নয় এটি কথাসাহিত্যেরও মহামূল্য ভান্ডার। সাধারণ মানুষের নিকট পালিসাহিত্যের গুরুত্ব জীবন-চিত্রের দিক থেকে হলেও উপাসক উপাসিকা, শ্রমণ-শ্রমণী, থের-থেরী, রাজা-সেনাপতি, কামার, ব্যাধ, চন্ডাল এবং গাণিকা এদের নিকট যেন জীবনের প্রতিমাগৃহ। এই জীবন বিচিত্রির প্রাণকেন্দ্র হলেন স্বয়ং গৌতমবুদ্ধ।

গৌতমবুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন মূল পালিসাহিত্যে নেই। নিকায় গ্রন্থগুলোর ভিতর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলো উপকরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘনিকায়ে মহাপদান সূত্তান্তে' পূর্ববুদ্ধ বিপসিস্র প্রসঙ্গে গৌতমজীবনের কিছু অংশ এবং 'মহাপরিনির্বাণ সূত্তান্তে' পাই বুদ্ধের অন্তিম জীবনের ঘটনা ও চিত্র মধ্য নিকায় এবং খুদ্দকণিকায়ে জাতক, সূত্তনিপাত প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বিনয়পিটকের কিছু অংশে বুদ্ধ জীবনের কিছু প্রসঙ্গ আছে। এ সকল গ্রন্থ হতে উপকরণ সংগ্রহ করে 'নিদান কথায়' এ জীবনের ধারাবাহিক চিত্র সংগ্রহীত হয়েছে। এখানে এই নিদানকথা ও অন্যান্য সূত্ত অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে বুদ্ধদেবের জীবন চরিত্র বিবৃত হচ্ছে:

ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিলো রাজা শুদ্ধোধনের শুদ্ধোধনের অগ্রমহিষী মায়াদেবীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করবেন, তিনি 'রাজচক্রবর্তী' হবে।

তখনকার রাজগৃহ-কাশী-কৌশাম্বী-কোশলাদি নিয়ে উত্তরে আয়াত এবং দক্ষিনে শকটমুখ' যে ভারতবর্ষ গড়ে উঠেছিলো তা ছিলো শতধা বিচ্ছিন্ন। সে বিচ্ছিন্ন ভারতে ৫৬৪ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রাজচক্রবর্তীর মতই গৌতমের আবির্ভাব হয়। ধন্য বিশাল শাল-শোভিত রমনীয় লুম্বিনী, যেখানে সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, ধন্য শাক্যকুলের মহারাজ শুদ্ধোধন, যার কুলপাবন পুত্র স্বয়ং

Dhaka University Institutional Repository

শাক্যসিংহ। পুত্রজন্মের পার মাতা মায়াদেবী-মায়ালীলা সংবরণ করেন,আর নবজাতককে স্নেহে পালন করেন ধাত্রী মাতা গৌতমী, তুষিত লোকাবতীর্ণ বোধিসত্ত্বের নাম রাখা হয় গৌতম।

ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিলো, 'জরাজিণ্ণং ব্যাধিতং মতং পব্বজিতং' (জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও প্রব্রজ্যা) দর্শন করে গৌতম সংসারে বীতস্পৃহ হবেন। রাজা শুদ্ধোধন ষোড়শবর্ষীয় পুত্রের প্রমোদ-বিহারের জন্য 'চতুসু দিসাসু' 'আরক্ষ' (প্রাসাদ) নির্মাণ করালেন কোনটি পঞ্চভূমক, কোনটি সপ্তভূমক, কোনটি নবভূমক- তাতে বিলাসের নানা নাটকীয় উপকরণ, সর্বোপরি সুন্দরী রাহুল মাতার বন্ধন। কিন্তু সে আকর্ষণও ব্যর্থ হলো, সত্য হলো ভবিতব্যের 'ভবত্যেব' বাণী। একদা উদ্যানভূমিতে ভ্রমন করতে গিয়ে সিদ্ধার্থ দেখলেন, জরা, ব্যধি, মৃত্যুর বীভৎস রূপ এবং প্রব্রজিতের প্রশান্তি।

সিদ্ধার্থের 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনা- যেমন করুণ, তেমনই করুনাপূর্ণ। তাঁর এই 'মহাভিনিষ্ক্রমণ' বুদ্ধশাস্ত্রে গৃহত্যাগ বলে খ্যাত।

'চত্তারি নিমিত্তানি' দর্শন করে সিদ্ধার্থ চিন্তিত হলেন। সিদ্ধার্থের এই মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের স্রোত যখন তীব্রভাবে প্রবাহিত হতে লাগল ঠিক সেই সময় যশোধারার পুত্র সন্তান প্রসবের খবর এল। খবর শুনে পুত্রের নাম দিলেন রাহুল। পালি ভাষায় যার অর্থ 'বিঘ্ন'।

তিনি এবার নিপুন সারথি 'ছন্দ'কে ডেকে অভিনিষ্ক্রমণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন এবং শেষবারের মত পুত্রকে দেখবার জন্য রাহুলমাতার কক্ষের গর্ভদ্বারে গেলেন, দেখলেন, মৃদু প্রদীপের আলোয় নবজাত পুত্রকে পরমস্নেহে বুকে নিয়ে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এ দৃশ্য দেখে তিনি প্রাসাদতল হতে অবতরণ করলেন এবং অশ্ববর কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহন করে 'উত্তরাসাঢ়া নক্খত্তে' গৃহত্যাগ করলেন। সঙ্গে চলল সারথি ছন্ন। ছন্ন বিদায় আর এক করুন দৃশ্য। অনোমা নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে রাজপুত্র গৌতম 'রজতপাত্র সদৃশ বালুকাপুলিনে' দাঁড়িয়ে খর্গ দ্বারা কেশ ছিন্ন করলেন এবং আভরণ খুলে ছন্নকে বললেন, 'ছন্ন মম বচনেনর মাতাপিতুন্নং আরোগ্যং বদেহি'। জগতের কষ্ট ক্লেশ বিনাশের জন্য সিদ্ধার্তের কঠোর অন্বেষণ শুরু হলো। জ্ঞানলাভের জন্য তিনি আলারকালাম, রামপুত্র উন্দক প্রভৃতি জ্ঞানতপস্বীর নিকট গেলেন। কিন্তু এতেও তাঁর পিপাসা নিবৃত্ত হলো না। অবশেষে তিনি উরুবেল্ল নগরে এসে অনাহারে কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনায়

Dhaka University Institutional Repository

নিমগ্ন হলেন। ছয় বছর ধরে তাঁর এ দৈহিক কৃচ্ছ্রসাধনা চলল। খাদ্য বর্জনের ফল তাঁর সুবর্ণ দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেলো এমনকি একদিন ধ্যানে বসে তিনি মহাবেদনায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে 'মধুপায়াস' নিয়ে আসলেন দারিকা সুজাতা'। নদীতে স্নান করে সেই অন্নভোজন করে সিদ্ধার্থ সুস্থ হলেন এবং কৃতসংকল্প হয়ে নিরঞ্জনা নদীতীরে বোধিবৃক্ষের মূলে পীঠে আসীন হলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আমার কাম, ত্বক, নখ, অস্তি শুষ্ক হোক, শরীরে, মাংস শোণিত শুষ্ক হয়ে যাক, সম্যকসম্বোধি লাভ না করে এই আসন ত্যাগ করব না।

এবার তার মধ্যে জ্ঞানের আলো প্রকাশ পেতে লাগল। রাত্রির প্রথম যামে তিনি পূর্বনিবাসজ্ঞান লাভ করলেন, মধ্যম যামে লাভ করলেন দিব্য চক্ষু এবং পশ্চিম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞান আয়ত্ত হলো। জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হলে অনুলোম প্রতিলোমক্রমে দুঃখের কারণ ও দুঃখনিরোধের উপায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করে তিনি চতুরার্য সত্যের এবং দুঃখনিরোধের অষ্টাঙ্গিক মার্গের সন্ধান লাভ করলেন।

এভাবে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন এবং বুদ্ধত্বলাভের পর বুদ্ধদেব ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময় অনাথপন্ডিতদক্রীত শ্রাবস্তীর 'জেতবন, রাজগৃহের 'বেণুবন, কৌশাম্বীর 'ঘোষিতারাম' বৈশালীপর 'সপ্তপর্ণীগুহা'- বুদ্ধ দেবেরে পুণ্য স্পর্শে ধন্য হয়।

৮০ বছর বয়সে [৪৮৪ খ্রীঃ পূর্বাব্দে] বুদ্ধদেব কুশীনারায় 'মহাপরিনির্বাণ' লাভ করেন'। মহাপরিনির্বাণের পূর্বে ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ্য করে তিনি শেষ বচন উচ্চারণ করেন, ভিক্ষুগণ, আমি শেষবারের মতো তোমাদেরকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গর, তোমরা অপ্রমত্ত হয়ে নির্বাণ কামনায় যত্নশীল হও। দুঃখের হাত হতে আত্যন্তিক নির্বৃতিই বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্য। জরা-ব্যাধি-মুত্যুর বিভীষিকা হতে ত্রাণ লাভের উপায় খুঁজে বের করবার জন্যেই তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-যোগে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, যা কিছু উৎপত্তিশীল, তাই ধ্বংসশীল। দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। এই চারটি আর্য সত্য সিদ্ধার্থের ধ্যানের আবিষ্কার। অনুলোম প্রতিলোম অনুসারে বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, দুঃখের মূল হলো 'দ্বাদশ নিদান'। আর এই দ্বাদশ নিদানের আবর্তন মাত্র অর্থাৎ পুনরাগমন হলো 'ভবচক্র'। আবার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতীত্যসমূৎপাদের (causal Production) মূল কারণ হলো অবিদ্যা। এই অবিদ্যা হতে সংস্কার, সংস্কার হতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হতে নামরূপ, নামরূপ হতে ষড়ায়তন (Six organs of Sense), ষড়ায়তন হতে স্পর্শ (Contact), স্পর্শ হতে বেদনা (Feelings), বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান, উপাদান হতে ভব (Becoming), ভব হবে জাতি (Birth) এবং জাতি হতে জরা-ব্যাধি-মৃত্যুরূপ দুঃখের উৎপত্তি। জাগতিক নিয়মে প্রত্যেকটা ঘটনার উৎপত্তির যেমন একটা কারণ থাকে অর্থাৎ বিনাকার্যে কোন ঘটনা ঘটে না তেমনি দুঃখের উৎপত্তির কারণ হলো কার্যকারণ সূত্র। অর্থাৎ জগতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তার বিনাশ অনিবার্য। আর এই চিরাচরিত নিয়মকে রোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং দুঃখেরও প্রতিরোধ আছে। আর এই নিরোধ বা প্রতিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

এই "অষ্টাঙ্গিক মার্গ"[৭] অবলম্বনে দুঃখ থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

"অষ্টাঙ্গিক মার্গ" হচ্ছে-

- সৎ দৃষ্টি;
- সৎ বাক্য;
- সৎ সংকল্প;
- সৎ কর্ম;
- সৎ জীবিকা;
- সৎ সাধনা;
- সৎ স্মৃতি এবং
- সৎ সমাধি।

আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধ প্রচারিত এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ, দেহ, বাক্য এবং চিত্তসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধ প্রচারিত পঞ্চশীল ও কুশলকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যেসব মানুষ মিথ্যায়, অনাচারে এবং অসৎসংকল্পে বিভ্রান্ত ছিলো তাদের নৈতিক ধর্মে দীক্ষিত করা। এছাড়াও ত্রিপিটকে অনেকবার বলা হয়েছে, বুদ্ধ প্রাণিহত্যা থেকে বিরত, অদত্তের গ্রহণ হতে বিরত, মৃষাবাদ থেকে বিরত, দ্যুত ও অলসক্রীড়া, তুচ্ছ নৃত্য গীত প্রদর্শন করা, জঘন্য কর্ম-প্রবঞ্চনা, অভিচারাদি কাজ থেকে বিরত, বৃথা আলাপ থেকে বিরত মিথ্যা ও হীন

Dhaka University Institutional Repository

জীবিকা অর্জন থেকে বিরত: তিনি অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষসারথি, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা। সমস্ত দিক থেকে এই যে পরিপূর্ণ মানুষ যিনি দ্বাত্রিংশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, যিনি লোকমধ্যে 'রাজচক্রবর্তী' যিনি সকল কুসংস্কারমুক্ত- এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠাই এই ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য। বৌদ্ধধর্ম এই দিক থেকে চিরকালের জন্য সার্বিক মানব-ধর্ম হিসেবে পরিচিত।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, মহামানব বুদ্ধদেবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র পালিসাহিত্য কিংবা বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যেই বিদ্যমান নয় বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারেও এটি যেমন পরিলক্ষিত তেমনি সসমাদৃত।

বুদ্ধের জন্ম থেকে মহাপরিনির্বান পর্যন্ত সেই সময়ের কিছু প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হলো :

বুদ্ধের জন্মস্থান, লুম্বিনী, নেপাল

Dhaka University Institutional Repository

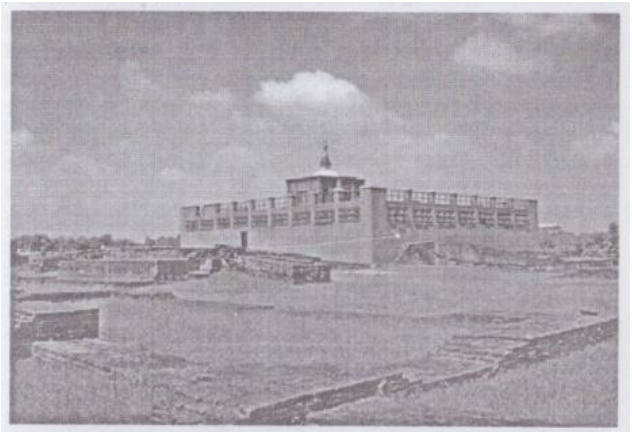

বুদ্ধের মাতা মায়াদেবীর মন্দির, লুম্বিনী, নেপাল

সূত্রঃ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, ড. কানাই লাল রায়, প্রকাশক- মিলন নাথ, অনুপম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল- ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ২৪,২৫

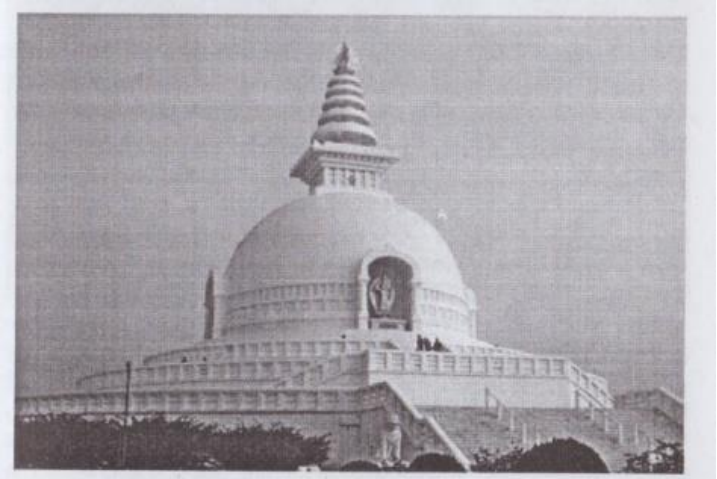

বুদ্ধের জন্মস্থানের উপর নির্মিত মন্দির, লুম্বিনী, নেপাল

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধের জন্মস্থানের ভেতরের দৃশ্য

গৌতম বুদ্ধ ও স্ত্রী যশোধরা

সূত্র: প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৭-৩২

Dhaka University Institutional Repository

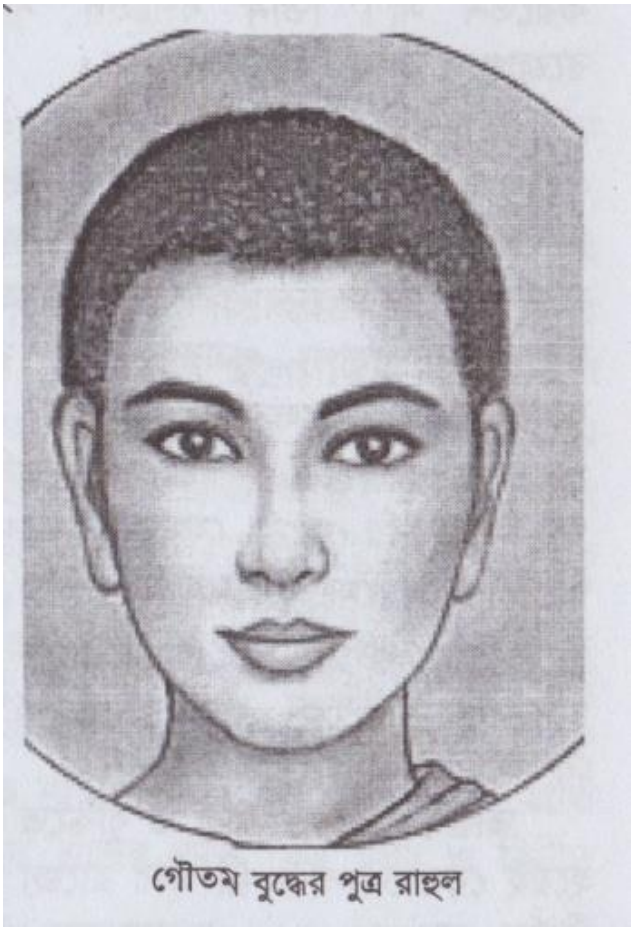

গৌতম বুদ্ধের পুত্র রাহুল

সূত্রঃ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৩

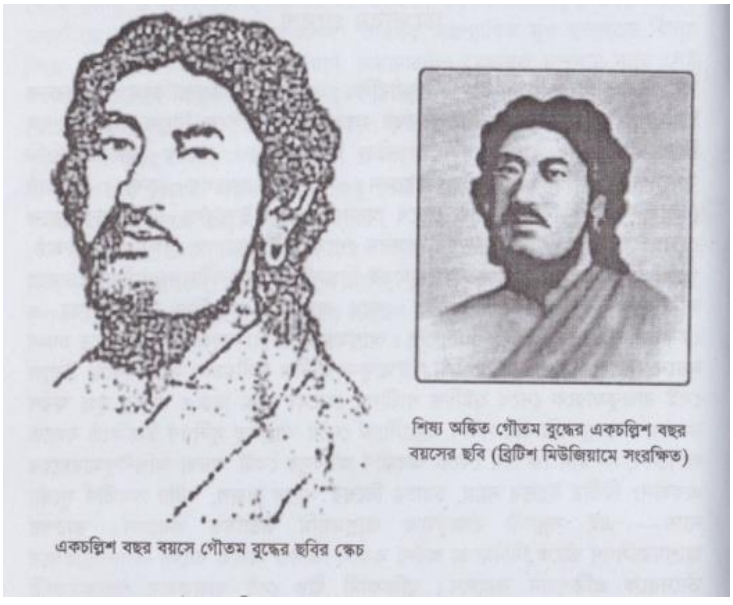

একচল্লিশ বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধের ছবির স্কেচ

শিষ্য অঙ্কিত গৌতম বুদ্ধের একচল্লিশ বছর বয়সের ছবি (ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)

সূত্রঃ প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

কষ্টিপাথরে বুদ্ধের মূর্তি

বুদ্ধের ব্রোঞ্চমূর্তি, ময়নামতি, কুমিল্লা

শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি

শায়িত অবস্থায় বুদ্ধের ব্রোঞ্জমূর্তি

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র: প্রাগুপ্ত, পৃ. ৮৮-৯২

মহাকাব্যে প্রথমে আর্শীবাদ স্তুতিবাক্য, প্রসংশা, নমস্কার বা বস্তুনির্দেশ থাকবে কখনো কখনো দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা বা সাধুব্যক্তির গুণকীর্তন থাকবে। মুণীন্দ্রনাথ কাওয়ালের সম্পাদিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রথম সর্গের প্রারম্ভিক শ্লোক নমস্কিয় দ্বারা আরম্ভ হয়। যেমন: সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করে যিনি বিধাতাকে জয় করেছেন. অন্ধকার দূর করে যিনি সূর্যদেবকেও পরাভূত করে যিনি রমণীয় চন্দ্রকেও জয় করেছেন, ইহলোকে যাঁার উমপা নেই, সেই অর্হৎকে (পূজনীয়) বন্দনা কর।'

বুদ্ধচরিত গ্রন্থ পাঠে আমরা দেখতে পাই শাক্যদের মধ্যে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি ছিলেন সকল গুণের অধিকারী। ইক্ষ্বাকুবংশ যেন এক বিশাল সমুদ্রের মতো সেই সমুদ্র থেকেই তার জন্ম আর প্রজাদের কাছে যিনি ছিলেন চাঁদের মতোই গৌরবময়ী। তিনি কল্যাণময় রত্নসমূহের সার-স্বভাবে ও সৌন্দর্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মতো। সুতরাং সূচনা বিষয়ক শর্ত ও (সাধুব্যক্তির গুণকীর্তন) রক্ষিত হয়েছে ধরে নেওয়া যায়।

বুদ্ধচরিত কাব্যের যে সংস্কৃত পুঁথি আবিস্কৃত হয়েছে তাতে ১৭টি সর্গ মাত্র পাওয়া গেছে। তার মধ্যে প্রথম ১৩টি সর্গ এবং চতুর্দশ সর্গের ৫১ সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত গবেষকগণ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা বলে স্বীকার করেন। বুদ্ধচরিত কাব্যে বর্ণিত বিষয়ানুসারেই সর্গগুলোর নামকরণ অশ্বঘোষের নামকরণ রচনা বলে স্বীকার করেন যেমন: প্রথম সর্গে ভগবান গৌতম বুদ্ধের জন্মকাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে বিধায় এ সর্গের নামকরণ করা হয়েছে ভগবৎ প্রসূতি এবং দ্বিতীয় সর্গে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজপ্রাসাদে রাজপুত্র হিসেবে বুদ্ধের জীবনচর্যার কথা বর্ণিত হওয়ায় তার নাম রাখা হয় অন্তপুরঃ বিহার অনুরূপভাবে, প্রতিটি সর্গেরই বর্ণিত বিষয় অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। সর্গগুলো নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়; প্রতিটি সর্গে কমপক্ষে ৫৬টি এবং উর্ধ্বে ১০৩টি করে শ্লোক আছে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের আভাসও লক্ষ্য করা যায়।

ধ্বনি মাধুর্য এবং অলংকারের ব্যবহার কাব্যখানি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। উপমা, রূপক এবং অনুপ্রাস প্রভৃতির প্রচুর ব্যবহারে কাব্যখানি সরস-সাবলীল ও প্রাণবন্ত হয়েছে। তাই ছন্দ ও অলংকার বিষয়ক শর্ত ও রক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

যেকোন মহাকাব্যে শৃঙ্গার, বীর ও শান্তরস এই তিনটির একটি মুখ্যরস হিসেবে থাকবে এবং অন্যান্য রস হবে অঙ্গরস। বুদ্ধচরিত কাব্যখানিতে তিনটি রসেরই অবতারনা দেখা যায়, তবে মুখ্যরস হিসেবে শান্তরসই প্রাধান্য লাভ করেছে। কাব্যখানির বিষয়বস্তু যেহেতু ধর্ম ও ধার্মিকের জীবনী নিয়ে রচিত, সেহেতু এতে বীররস পরিবেশিত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রাজ্য জয় কিংবা ব্যক্তি বিশেষকে পরাভূত করে যে বীরত্ব প্রদর্শন করা হয় তা উক্ত কাব্যে অনুপস্থিত। এতে প্রেম, প্রীতি এবং মৈত্রী করুণার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করার মধ্যে যে বীরত্ব ঔদার্যের গুণগৌরওে বীররস দৃষ্ট হয়। এ কাব্যের নায়কের চরিত্র শৌর্যে, বীর্যে এবং ঔদার্যের গুণগৌরব অনন্য সাধারণ, যা মানব মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, মহত্তবোধে উদ্রেক করে এবং আবেদন সার্বজনীন। বুদ্ধ যত বড় শাস্ত্রবীর তার চেয়ে বড় আদর্শবীর বা নীতিবীর। বুদ্ধচরিত নৈতিক বীর্যের মহিমাই প্রদর্শিত হয়েছে। শৃঙ্গার রসের বর্ণনা আবেদনময় এবং প্রাণস্পর্শী। বিশেষত নারীর কলা-কৌশলের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে বুদ্ধচরিত কাব্যে। এর কিছু সাধারণ, আবার কিছু তীব্র ইঙ্গিতগর্ভ, যা সংযমের বাঁধ চূর্ণ করে দেয়। বুদ্ধচরিতের চতুর্থ সর্গে অশ্বঘোষ বনভূমিতে অপরাহ্নের আসন্ন অন্ধকারে উন্মত্ত যৌবনবতীদের দিয় শৃঙ্গার রসের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়েছেন প্রাণঘাতী আবেদনে, কিন্তু তার সঙ্গে নায়ক বা নায়িকার সংযোগ না থাকায় এবং নায়কের অনুষ্ণভাব বা প্রত্যাখানের কারণে তা পরাজয়ের গ্লানিতে ম্লান হয় যায় এবং তা সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও রসের সৃষ্টি করেনি। শৃঙ্গার রসের অবতারণায় এ গ্রন্থে দেখা যায়। কোনো কোনো নারী মদমত্ত হয়ে তাদের কঠিন ও পরিপুষ্ট, সংহত ও উন্নত স্তন দিয়ে তাকে স্পর্শ করল। কোনো কোনো নারীর শীতল স্কন্ধ থেকে লম্বিত বাহুলতা। তারা মিথ্যা পদস্খলনের অভিনয় করে তাঁকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করল। অন্য নারীর তাদের স্বর্ণকলসের মতো স্তনসমূহ দেখাতে দেখাতে কুসুমিত আম্রশাখা ধরে ঝুলতে লাগল। কোনো নারী মত্ততার ছলে বারবার তার নীল শাড়ি শিথিল করে দিতে লাগল, তাতে ঈষৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল কোমরের কাঞ্চিমালা। রমণীকে মনে হলো যেন বিদ্যুৎ বিকশিত রাত্রি।

শান্তরস এ কাব্যের প্রধান রস। কাব্যখানিতে কামনা-বাসনার সংঘর্ষ, সংক্ষোভ অতিক্রম করে শান্তির সুমহার মূর্ছনা ধ্বনিতে হয়েছে ছত্রে ছত্রে।[৮] বুদ্ধচরিত কাব্যে অঙ্গীরস হিসেবে করুণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

হাস্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। পঞ্চম সর্গে নায়কের গৃহত্যাগের কাহিনিতে দেখা যায় করুণরসে সিক্ত। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী এবং স্বীয় নবজাতককে ত্যাগ করে সন্ন্যাস যাত্রায় নায়কের পাষাণ হৃদয়ের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা যতটুকু না আহত করে তার চেয়ে অনেক বেশি বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাছাড়া এ কাব্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনিত্যতার যে সুরঝংকার তা করুণরসে সিক্ত এবং হাস্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায় বিক্ষিপ্তভাবে। ত্রয়োদশ সর্গে বিকট বিকট মূর্তির অসামঞ্জস্য দেহভঙ্গি এবং আস্ফালনের (শূকর, গর্দভ, মৎস্য, অশ্ব, আর উটের মতো তাদেরও মুখ, কারও মুখ বাঘ, ভালুক, সিংহ বা হাতির মতো; কারও একটি চোখ, কারও অনেক মুখ.....)। মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা দেখায যায়, তা কিছুটা হাস্যরসের উদ্রেক করলেও অনুভূতির উপরেই নির্ভর করে।

উপযুক্ত বর্ণনা হতে বোঝা যায় কাব্যটিতে রসবিষয়ক বৈশিষ্ট্যও অনুসৃত হয়েছে। মহাকাব্যের গুণ বৈশিষ্ট্যগুলো বুদ্ধচরিতে সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। তৃতীয় সর্গের ৬৫ নং শ্লোকে পরিবেশ বর্ণনা, ষষ্ঠ সর্গের ৩৩নং শ্লোকে পুত্র জন্মকথা, এ কাব্যে বুদ্ধের জীবন চরিতে চতুবর্গ ধর্ম-অর্থ-কাম এবং মোক্ষ-এর বর্ণনা পাওয়া যায়।

নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাকাব্য সমাপ্ত হয়। বুদ্ধচরিত কাব্যের নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতম। নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতম স্ত্রী-পুত্র, ধন-জন-রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী অবলম্বন করেন। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম এবং বন্ধুর পথ অতিক্রম করে লাভ করেন বুদ্ধত্ব। বুদ্ধত্ব লাভের মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেন জগতের প্রকৃত স্বরূপ দুঃখের কারণ এবং জীবন দুঃখের অবসান ঘটানোর সঠিক পথ। বহু ব্যক্তি তাঁর অনুগামী শিষ্য। মহাকাব্যে নায়ক দেবতা বা সদ্বংশজাত ক্ষয়িত্র এবং ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন হবে। বুদ্ধচরিত কাব্যের নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তু রাজ্যের শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র। শাক্যরা ক্ষত্রিয় জাতি। তাঁর চরিত্র ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল। তিনি বিনীয়, দৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘা করেন না, হর্ষ-শোক প্রভৃতিতে অভিভূত হন না। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, আহার না পেয়েও তিনি দুঃখ পাননি, বোধিলাভ হয়নি দেখে শরীর রক্ষার জন্য নদীর তীর থেকে শাখাপাত্র ধরে উঠে এসেছিলেন আহারের সন্ধানে এবং নন্দবালার কাছে

Dhaka University Institutional Repository

পায়স পেয়েও তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। এককথায় বলা যায়, তাঁর শমগুণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তাঁকে ধীরোদত্ত নায়কের মর্যাদা দেয়।

উপযুক্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে মহাকাব্যের প্রায় লক্ষণই পরিস্ফুট। সংস্কৃত বা অন্যান্য মহাকাব্যে সাধারণত নায়ক-নায়িকা এবং এতে বিরহ-মিলন প্রভৃতি ব্যাপারই প্রাধান্য লাভ করেছে। সে সকল মহাকাব্য হতে বুদ্ধচরিত ভিন্নধর্মী। কারণ কাব্যখানি ধর্মগুরুর জীবনী এবং ধর্মমত অবলম্বনে রচিত এবং নৈতিক আদর্শে পূর্ণ।

বুদ্ধচরিত ধর্ম এবং ধার্মিকের জীবনী নিয়ে রচিত তত্ত্বকাব্য। অশ্বঘোষের প্রধান পরিচয় কবি, পরে তাত্ত্বিক। বস্তুর রূপময় বিশ্লেষণই কবিত্বের লক্ষণ। অশ্বঘোষ সে শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ভাষাপ্রিয় কবি, ভাষার মাধ্যমে ভাবের মূর্ত প্রকাশ ঘটাতে তিনি পটু ছিলেন ফলে তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর বর্ণনা সাম্প্রাদায়িক পরিভাষায় জটিলতা ধারণ না করে হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বজনীন। অর্থব্যক্তি ও প্রাঞ্জলতা তার কাব্যের অন্যতম শিল্পগুণ। সহজ-সরল অনাড়ম্বরতা, শব্দমাধুর্য এবং অলংকারের ব্যবহার অশ্বঘোষের রচনাকে ওজস্বী ও গাম্ভীর্যময় করে তুলেছে। মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মতে, শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ কান্তি এবং সমাধি- এই দশটি কাব্যের গুণ। বৈদর্ভ মতে এই গুণগুলো কাব্যের প্রাণস্বরূপ। অশ্বঘোষের রচনায় এই দশবিধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষত প্রসাদ এবং মাধুর্য তাঁর কাব্যকে সত্যই মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তাঁর রচনা যেমন সহজবোধ্য তেমনি অলংকারসমৃদ্ধ। বিশেষত বৌদ্ধ দর্শনের জটিল বিষয়গুলো তাঁর কাব্যে জটিলতা পরিহার করে যথার্থ কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। তাই অশ্বঘোষের রচনা যেমন ভাবঘন তেমনি রসঘন।[৯]

অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যে যে জীবনীকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন তা নৈতিক আদর্শে পূর্ণ এক মহাজীবন বুদ্ধের জীবনরচিত। তিনি সেই মহাজীবনকে আশ্রয় করে বর্ণনাবাহুল্যে, মানবমনের যে আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা'য় পর্যবসিত হয়েছে এবং আপন স্থান-কালকে অতিক্রম করে এমন একটি সুষম আনন্দনিকেতন সৃষ্টি করেছে যেখানে মানবাত্মার স্পন্দন প্রস্ফুট। এখানেই বুদ্ধচরিতের মহত্ত্ব। যে কাব্যের আবেদন সার্বজনীন এবং মানব মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, তা মহাকাব্য পদবাচ্য। বুদ্ধচরিত গ্রন্থের অনুবাদক

Dhaka University Institutional Repository

কাওয়েল এবং জনস্টন্ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যতম সমালোচক কিথ, উন্টারনির্টস এবং নরিমন প্রমুখ গবেষক ও বুদ্ধচরিতকে প্রকৃত মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। M. Winternitz- এর মতে 'Here we have indeed for the first time an actual epic of Buddha. Created by a real poet, a poet who, filled with intense love and reverence for the exalted figure of the Buddha, and deeply imbued with the truth of the Buddha doctrine is able to present the life and doctrine of the Master in noble and artistic, but not artificial Language. [১০]

বুদ্ধচরিতের অনুবাদক মুণীন্দ্রনাথ চক্রববর্তীর মতে, মহাকাব্যের সর্বগুণ বৈশিষ্ট্য বিভূষিত বুদ্ধচরিত মহাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নাই। [১১]

বুদ্ধচরিত একটি আদর্শ মহাকাব্য। মহাকাব্যের যতগুলো গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তার সবই বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে দৃষ্টনীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ এবং সস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে মহাকাব্যের গুণাগুন নির্দেশের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। আচার্য দণ্ডী, ভামহ, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখ অলংকারিকের রচনায় মহাকাব্যের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয়েছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং বিশ্বনাথ- এর সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে মহাকাব্যের গুণাগুণ ও লক্ষণের সাথে বুদ্ধচরিতের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়।

মহাকাব্য বিবরণমূলক রচনা এবং তাতে আগাগোড়া একই ছন্দ ব্যবহার। মহাকাব্য নাটকীয়, বর্ণনাত্মক রীতিতে রচিত এবং যা এক বৃত্তময়। এর বিষয়বস্তু হবে একক, অখণ্ড ও সম্পূর্ণ। এর আরম্ভ, মধ্য ও অন্ত্য সন্ধি। মহাকাব্য সাধু সজ্জন ব্যক্তির জীবন চরিত, মহত্তপূর্ণ গুরুগম্ভীর, বিরাট এবং ঐতিহাসিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হতে হবে। কবির বিষয়বস্তু নায়ক বা অন্য কারো নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে।

মহাকাব্যের গুণাগুণের বিচারে বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের সার্থকতা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নিবেদিত হলো-বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয়বস্তু ও ভাষা বিচারে একটি সার্থক মহাকাব্য। কপিলাবস্তু নগরের বর্ণনা দিয়ে 'বুদ্ধচরিত' কাব্যে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। কথিত আছে যে, মহাকাব্যের বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক অথবা সাধুজ্জনের জীবনেতিহাস হওয়া বাঞ্ছনীয়। বুদ্ধচরিতের বিয়ষবস্তু

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ যা ইতিহাস ও সাধুসজ্জন সম্মত হয়েছে। মহাকারুণিক গৌতমই 'বুদ্ধচরিতের' বিষয়বস্তু।

মহাকাব্যের সর্গ লক্ষণে বুদ্ধচরিত ১৭ সর্গ এবং প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের আভাস দেয়া আছে, ছন্দগত দিক দিয়েও বুদ্ধচরিত মহাকাব্য। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতি শিক্ষা, দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, জনমুখী আদর্শ সাম্যবাদের বর্ণনা বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বর্ণনায় প্রতিভাত হয়ে ভিত্ রচিত হয়েছে। জাতি, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, সামগ্রিক প্রেক্ষাপট ও জীবন গঠন জাতি-প্রকৃতি ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে।[১২]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে আটটি সর্গ বা অংশ অধ্যায় যেগুলো অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি দীর্ঘ নয়। এর বিষয়বস্তু হলো এক মহাপুরুষের জীবনী। এর নায়ক ধীরোদাও, ক্ষত্রিয় বংশজাত। বিষয়বস্তু ও নামকরণ যথার্থ। এতে বসন্ততিলক, ইন্দ্রবজ্রা, পুষ্পিতাগ্রা, উপজাতি, মালিনী, সালিনী, উপচিত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দ ও কাব্য ও রস ব্যবহৃত হয়েছে।[১৩]

মহাকাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অস্থিরতা বিদ্যমান। সেই লক্ষণ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যে নদীর তীরে, অশ্বথমূলে একাকী পদাসনে, আত্মাহিতে বিশ্বহিতে ধীরোদাত্ত নায়ককে আবার ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তবে এটি অন্যান্য মহাকাব্যের মতো রক্তলোলুপ দৃষ্টিভঙ্গর যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ জ্ঞান-ধ্যান তথা বীর্যশক্তির সাথে অশুভ (মার) শক্তির যুদ্ধ। ক্ষান্তিবাদী যুদ্ধের জীবন প্রকৃতি শান্ত রসের সমন্বয়ে উপস্থিত হয়েছে। রস সাহিত্য বিচার ও বিশ্লেষণেও মহাকাব্য বুদ্ধচরিত সার্থক।

মহাকাব্যের লক্ষণে বি ভিন্ন রসের অবতারণা দৃষ্টনীয়। মহাকাব্য সকল আদিরস, বীররস বা শান্তরস প্রধান মধ্যে মধ্যে অন্যান্য রসেরও প্রসঙ্গ থাকে। বুদ্ধচরিত কাব্য শান্ত রসের প্রাধান্যে রচিত হয়েছে। কথিত আছে মহাকাব্যে আদিরস অপরিহার্য। মহাকবি অশ্বঘোষ চতুর্থ সর্গে শৃঙ্গার আদিরসের বর্ণনা করেছেন। তবে বিষয়বস্তুকে সরস, প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য তিনি ঐতিহাসিক ঘটনার পাশাপাশি পৌরাণিক বিষয়েরও অবতারণা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ কব্যে দেখা যায়, অপরূপ সুন্দরী রমণীগণ নানা রকম ছল-ছাতুরী ও রূপ মাধুর্যের দ্বারা কুমার সিদ্ধার্থকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা বুদ্ধের বীর্যশক্তির কাছে পরাভূত হলেন। মহাকাব্যের ঘটনা ঐতিহাসিক ও সজ্জনাশ্রয়ী হবে; এতে চার বর্গের কথা থাকবে। একটি বর্গই মুখ্য। বুদ্ধচরিত কাব্যে সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন ঐহিহাসিক, তিনি সাধুজ্জন এবং নানা গুণে গুণান্বিত। ধর্মীয় ও সামাজিক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ও দিকনির্দেশনা মহাকাব্যে বিদ্যমান। বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের কাহিনিতে সে মূল স্রোতধারা অনুসৃত, এতে ধর্মীয় মূল্যবোধ, শিক্ষাদর্শ, সামাজিক বিবর্তন, নীতিশিক্ষা অথবা সামাজিক প্রতিবিম্বের নিখুঁত প্রতিচ্ছভি প্রতিভাত হয়েছে।

মহাকবি অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয় কাহিনি এবং নায়কের নামানুসারে মহাকাব্যের নামকরণ করেছেন এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ সর্গ, অধ্যায় নামকরণ করায় মহাকাব্যের লক্ষণ অনুসৃত হয়েছে। যেমন- কাব্যের নায়ক বুদ্ধের নামে নামকরণ করেছেন 'বুদ্ধচরিত'। আর প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বৃত্তান্ত সূচনা বা আভাস দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ দিক দিয়ে বিচার করলে 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যও বৈশিষ্ট্য গুণে পরিপূর্ণ সার্থক মহাকাব্য। বুদ্ধচরিতের বিষয় কোথাও গুরুগম্ভীর কোথাও তীব্র আবেগময় মহানুভবতায় পরিপূর্ণ হয়েছে।

বুদ্ধচরিত কাব্যে মহত্ত ও বিশালতা বিদ্যমান। যে জীবন এর বিষয়, সেটি স্বয়ং বিরাট। বুদ্ধের জন্মের বৃত্তান্তটির জন্যই কবির বিস্তর আয়োজন। তাঁকে তিনি দেখিয়েছেন কুসুমদামসজ্জিত, দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম প্রাসাদপুরীতে, দেখিয়েছেন পথে, বনে, পিতৃ সন্নিধানে, সুত মিত রমণী অঙ্গনে, অশ্বের আরোহীরূপে।

বুদ্ধচরিতে দেশ-কালের পটভূমি থাকলেও মহাজাগতি আবেদন বেশি। এ কাব্যে হাস্যরসের অভাব আছে মনে হলেও পঞ্চম সর্গে নিদ্রিত নারীদের বর্ণনায় সুন্দর বলে প্রতিভাত যারা তাদের অসৌন্দর্যের প্রতিপাদন। ত্রয়োদশ সর্গে বিকট-বিকট মূর্তির অসাঞ্জস্য বর্ণনা আছে। বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্থ সর্গে শৃঙ্গার রসের প্রাদুর্ভাব দেখিয়েছেন; এতে উদার সারল্য ভাব প্রতিটি সর্গে প্রকটিত হয়ে উঠেছে। বুদ্ধচরিত কাব্যে করুণ রসও প্রচুর। উপমার ব্যবহার করেছেন কবি প্রতিটি বর্ণনায়। এতে আদি থেকে অন্ত অবধি অনিত্যতার সুর বিদ্যমান 'বুদ্ধচরিত' তত্ত্বের

Dhaka University Institutional Repository

কাব্য, কিন্তু অশ্বঘোষ আগে কবি পরে তাত্ত্বিক। বুদ্ধচরিতের বিষয় এক মহাজীবন যা স্থান এবং কালকে অতিক্রম করেছে। মহাকাব্যে প্রধান চরিত্রের সাফল্যই মহাকাব্যের সার্থকরা। বলা হয় The epic hero always represented humanity by being superman. বুদ্ধচরিতের প্রধান চরিত্র বুদ্ধের জীবনও তাই হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় মহাকাব্যে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা ও উদাহরণ থাকে। সে অর্থে বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের পটভূমি বিশাল, তাৎপর্যপূর্ণ। চন্দ্র, সূর্য, প্রদোষ, রজনী, প্রভাত, সন্ধ্যা, স্বর্গ, নরক, পুরী, বিরহ, বিবাহ, মিলন, সমুদ্র, রাজপ্রাসাদ, পর্বত, মৃগয়া, বন, নগর, ঋতু, উদ্যান, ক্রীড়া, যুদ্ধ, যজ্ঞ, পুত্রজন্ম প্রভৃতি। বুদ্ধচরিত কাব্যে এ সকল বিষয়ের আলোচনা যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। মহাকবি অশ্বঘোষের অমর সৃষ্টি "বুদ্ধচরিত" একটি যথার্থ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সার্থক মহাকাব্য। মহাকাব্যের সকল প্রকার লক্ষণসমূহ বুদ্ধচরিত কাব্যে বিদ্যমান। তাই এটি একটি অন্যতম সার্থক মহাকাব্য। অর্থাৎ, বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যের সর্বগুন ধর্মে পূর্ণাঙ্গ একটি সার্থক মহাকাব্য হিসেবে পুণমূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশঃ

১। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধসমাজ, শ্রীশান্তি কুসুম দাশ গুপ্ত, ১৯৯৮, Publisher- D.L.S. Jayawardana, for Maha Bodhi Book Agency, 4A, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-73. P. 1

২। ড. দেব কুমার দাস, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, ৫ম সঙ, পৃ.৬১

৩। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য: মধুসূদন ও অনুসারীবৃন্দ, ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ. ৩৪

৪। পূর্বোক্ত, শিশির কুমার দাশ, কাব্যতত্ত্ব, (অনু) প্যাপিরাস কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ. ৮৪

৫। ড. কানাই লাল রায়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, প্রকাশক, মিলন নাথ, অনুপম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা, ১১০০, প্রকাশকাল- ২০১৩, পৃ. ১১-১২

৬। মাইকেল মধুসূদন দত্ত- প্রণীত, মেঘনাদবধ কাব্য, সম্পাদনা, অধ্যাপক শ্রীসু কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক, শ্রীসত্যনারাযন ভট্টাচার্য্য, বি.বি. ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৬/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩, পৃ.২১

৭। পূর্বোক্ত, জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ২৪৮-২৫২

৮। ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সংস্কৃত আলঙ্কা রিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যাযন (প্রবন্ধ) করা অনুষদ পত্রিকা, জুলাই ২০০৫- জুন ২০০৬, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৩

৯। পূর্বোক্ত, সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যায়ন, পৃ. ৮৫

১০। পূর্বোক্ত, দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সংস্কৃত অলঙ্কারিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতের মূল্যায়ন, পৃ.৮৬

১১। মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভূমিকা বুদ্ধচরিত, ধর্মাংকুর বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ.৯

১২।ড. বরীন্দ্র বিজয বড়ুয়া পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

১৩। নালন্দা, মহাযান বৌদ্ধদর্শন সংখ্যা, সম্পাদক, ড. অমল বড়ুয়া, ২০০৬, কলকাতা, পৃ. ৩২

চতুর্থ অধ্যায়

বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে অলংকার

'বুদ্ধচরিতম্' কাব্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, বর্ণনা, রচনালশৈলী এবং বিষয়বস্তুতে 'অলংকার' বলিষ্ট উপকরণ হিসেবে একটি স্থান দখল করে আছে। কেননা, অলংকার যেকোন সাহিত্য, গ্রনথ কিংবা কাব্যের সৌন্দর্য ভাব, ভাষা, বর্ণনা, রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য আপাদন করে তাকে রসাত্মকজগতে উত্তীর্ণ করে পাঠক হৃদয়কে আনন্দে আপ্লুত করে তোলে। অর্থাৎ অলংকারের কাজ হলো কাব্যের সৌন্দর্য বর্ধন করা। আর প্রত্যেক মানব মন হলো সৌন্দর্য পিপাসু। সৌন্দর্যে মানব মান আনন্দিত হয়। তাইতো বলা যায়, সৌন্দর্যের সাধারণ লক্ষণ হলো মানব চিত্তের আনন্দ সঞ্চিারিত করা। চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত ছাড়া যেকোন কাব্য জগতে বা সাহিত্য জগতে রস সমৃদ্ধ হতে পারে না এবং পাঠক হৃদয়ও রমিত করতে পারে না। মানবচিত্তে আনন্দ দান করতে পারে বাক্যে ব্যবহৃত ধ্বনি, শব্দ, অর্থ। যে বাক্যের ধ্বনি, শব্দ, অর্থ ইত্যাদির কোনগুন বিচার-বিশ্লেষন করা যায় না সে বাক্য সাহিত্যরসে পরিণত হতে পারে না।

অলঙ্কারের সংজ্ঞা

আমরা জানি, ভাবের বাহন ভাষাকে রসসিক্ত করে প্রকাশ করে। অতএব ভাবকে মধুর, মনোহর ও গুণে- সার্থক করে তোলার জন্য যেই কলা-কৌশল সাহিত্যে গ্রহণ করা হয় এবং শিল্প চাতুর্য্য ও ধ্বনি- মাধুর্য্যের দ্বারা সাহিত্যকে চমৎকারিত্ব করা যায় তাকে বলা হয় অলঙ্কার। এক কথায় বলা যায়, যা শব্দ ও অর্থকে অলঙ্কৃত করে তাকেই বলা হয় অলঙ্কার।[১] অলঙ্কারের মধ্যে দুটি ধর্ম বিদ্যমান। একটি হলো কার্য্যের বহিরঙ্গ, আর অন্যটি হলো অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ধর্মের অলঙ্কারকে আমরা শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আর অন্তর ধর্মগুলো অলঙ্কারকে আমরা শব্দ ও অর্থগুণ হিসেবে বিচার করতে পারি।[২]

অলঙ্কারের বুৎপত্তিগত অর্থ ও স্বরূপ বিচার

Dhaka University Institutional Repository

অলঙ্কার শাস্ত্রকে সাহিত্যের 'দর্শনশাস্ত্র' বলা হয়েছে। প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যেমন একটা দর্শন থাকে তেমন একটি সৌন্দর্যবোধ থাকে। এই দর্শন এবং সৌন্দর্য্যবোধই সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্ম দেয়।

মানব মন হলো সৌন্দর্য্যপিপাসু। সৌন্দর্য্যে মানুষের মন উল্লাসিত হয়। তাই দেখা যায়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের অনন্ত সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসার অনন্ত সাধনা। আর আমরা এও জানি, সৌন্দর্য্যের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করা চিত্তে আনন্দ সঞ্চার ব্যতীত কাব্য বা সাহিত্য রস সমৃদ্ধ হতে পারে না এবং পাঠকচিত্ত রচিমও করতে পারেনা। বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ, ধ্বনি, অর্থই মানবচিত্তে আনন্দ দান করতে পারে। যেই বাক্যের শব্দ, ধ্বনি, অর্থ প্রভৃতির কোন গুণ বিচার করা যায়না সেটা সাহিত্যরসে পরিণত হয় না। আর সেই কারণেই কাব্যে, সাহিত্যে অলঙ্কার শাস্ত্রের জ্ঞান অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ বলেছিলেন- সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার।[৩] এই যদি অলঙ্কারের অর্থ হয় তাহলে অলঙ্কার শাস্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় 'সৌন্দর্য শাস্ত্র' বা 'কাব্য সৌন্দর্য বিজ্ঞান'। ইংরেজিতে একে বলা হয় "Aesthetic of Poetry"। আর অন্যদিকে অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যশ্রী- যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "The beautiful of Poretry"। 'অলঙ্কার' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অলম্-কৃ (করা) + ঘঞ্-করণ বাচ্যে।[৪] সংস্কৃত অলঙ্কার শব্দের অর্থ ভূষণ, আভরণ প্রভৃতি। অর্থাৎ যা দিয়ে দেহ বা শরীরকে সজ্জিত বা ভূষিত করা যায় তাই 'অলঙ্কার'। আবার অন্য অর্থে 'অলম্' শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ হচ্ছে 'পর্যাপ্তি' 'প্রাচুর্য' বা পরিপূর্ণতা। 'অলম্' অর্থাৎ বস্তুর পর্যাপ্তি বা পরিপূর্ণতা যা দ্বারা সিদ্ধ হয় তাই 'অলঙ্কার।[৫]

অলঙ্কারকে আর একটি শব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। সে অর্থে অলঙ্কার এর প্রতিরূপ হলো 'চরম'।[৬] অর্থাৎ রসধ্বনিই কাব্যের চরম পরিণাম। এজন্য লোচনটীকায় বলা হয়েছে- "রস এব বস্তত আত্মা, বস্তুলঙ্করধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যতে।" অর্থাৎ রসধ্বনিই কাব্যের চরম পরিণাম।[৭] সেদিক থেকে বিচার করলে 'অলম্' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'ব্যাস', 'আর কাজ নেই' প্রভৃতি।[৮] এই অলঙ্কৃত বাক্যই হচ্ছে রাসাত্মক বাক্য।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের আলোচিত বিষয় 'বুদ্ধচরিতম্' মহাকাবব্যে অলংকার। এ গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের অলংকার ব্যবহৃত হয়ে কাব্যকে শ্রুতিমধুর করে পাঠকচিত্তকে রমিত করে তুলছে। উপমা, উৎপেক্ষা, যুক্তি ইত্যাদি অলঙকার ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

উপমা অলঙ্কার

লক্ষণ : সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।।

অন্বয় : বাক্যৈক্যে (বাক্যস্য ঐক্যে-একত্বে সতি) দ্বয়োঃ অবৈধর্ম্যং বাচ্যং সাম্যম্ উপমা (নাম অলংকারঃ)।

অর্থ : একই বাক্যে দুটি বিজাতীয় পর্দার্থের মধ্যে যদি বিরুদ্ধ ধর্ম না থাকে, গুণক্রিয়াদিগত সাদৃশ্যকে স্পষ্টরূপে ইবাদি শব্দ দ্বারা প্রতিপাদন করা হয় (শব্দ দুটি বাচ্য হয়) তাহলে উপমা অলংকার হয়।

উদাদহরণ:

মধুরঃ সুধাবদধরঃ পল্লবতুল্যোহ তিপেলবঃ পাণিঃ।
চকিতমৃগলোচনাভ্যাং সদৃশী চপলে চ লোচনে তস্যাঃ।।[৯]

অন্বয় : তস্যাঃ অধরঃ সুধাবৎ মধুরঃ পাণিঃ পল্লবতুল্যঃ অতিপেলবঃ, লোচনে চকিতমৃগলোচনাভ্যাং সদৃশী চপলে।

[তার (তরুনীর) অধর সুধার মত মধুর, হস্ত পল্লবের ন্যায় কোমল, নয়ন ত্রস্ত হরিণীর নয়নের ন্যায় চঞ্চল।]

তাৎপর্য: আলোচ্য শ্লোকে তিনটি ক্ষেত্রে উপমা অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে।

প্রথমত, সুধা এবং অধরের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। শব্দ দুইটি স্বভাবধর্মে বিজাতীয়, কিন্তু এদের মধ্যে একটি গুণগত সাম্য রয়েছে, সেটি হচ্ছে মধুরত।

দ্বিতীয়ত, পল্লব এবং পাণির মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এরাও স্বভাবধর্মে বিজাতীয়। এদের মধ্যেও একটি গুণগত সাম্য বিদ্যমান সেটি হচ্ছে পেলবতা বা কোমলতা।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত, মৃগলোচন এবং যুবতীর লোচনের মধ্যে তুলণা করা হয়েছে। এরাও স্বভাধর্মে বিজাতীয়, এদের সাধারণ ধর্ম হচ্ছে চপলতা। এখানে সুধা, পল্লব ও মৃগেলোচন উপমান এবং যথাক্রমে অধর, পাণি ও যুবতীর লোচন উপমেয়। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, উপর্যুক্ত শ্লোকের তিনটি ক্ষেত্রেই 'উপমা' অলংকারের সার্থক প্রয়োগ হয়েছে।[৯]

উৎপ্রেক্ষা

লক্ষণ : ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।।

অন্বয : প্রকৃতস্য পরাত্মনা সম্ভাবনা উৎপেক্ষা ভবেৎ।

অর্থ : প্রকৃতকে প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি পরাত্মা বলে উৎকট সংশয় হয়, তাহলে উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়।

উদাহরণ : উরুঃ কুরঙ্গকদৃশম্চঞ্চলচেলাঞ্চলো ভাতি।

সপতাকঃ কনকময়ো বিজয়স্তম্ভঃ স্মরস্যেব।।[১০]

[মৃগনয়নার-চঞ্চলচেলা অঞ্চল সংযুক্ত উরুদেশ যেন অনঙ্গদেবের পতাকাযুক্ত স্বর্ণময়-বিজয়স্তম্ভের মত শোভা পাচ্ছে।]

তাৎপর্য: এই শ্লোকে 'ইব' অব্যয়পদের প্রয়োগ হয়েছে। এখানে উরুদেশ উপমেয় এবং বিজয়স্তম্ব উপমান। উরুদেশকে বিজয়স্তম্ভ রূপে মনে করা হচ্ছে বলে 'এককোটিক (একপক্ষ)' সংশয় হয়েছে এবং উপমেয় মৃগনয়নার-চঞ্চলচেলা অঞ্চল সংযুক্ত উরুদেশকে উপমান বলে বোধ হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলংকার হয়েছে। এই অলংকারে-উপমানকেই প্রধান বলে মনে করা হয় এবং এই অলংকারে ইব, মন্যে, শঙ্কে, ধ্রুবম্, প্রায়, ন্যূনম্, প্রভৃতি পদের ব্যবহার হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়। বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে উপরে উল্লেখিত অলংকার গুলোর প্রয়োগ যথাযথ ভাবে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। "অলঙ্করোতি শব্দার্থাবিত্যলঙ্কার ইষ্যতে", কৃষ্ণশমা, পৃ. ১০৯

২। সাহিত্য দর্পণঃ, পৃ. ঠ

৩। 'সোন্দর্যম, অলঙ্কার', কাব্যালঙ্কার ১/১/২

৪। সুধীর কুমার দাসগুপ্ত, কাব্যশ্রী, কলিখাতা, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ.১

৫। প্রাগুক্ত

৬। প্রাগুক্ত

৭। শ্রী রামচরণ তর্কবাগীশ, সাহিত্য দর্পণঃ শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, পৃ.ঞ

৮। কাব্যশ্রী, পৃ. ১

৯। সাহিত্যদর্পনে অলংকার, ড. মাধবী রাণী চন্দ, ময়না তালুকদার, প্রকাশক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, প্রথম প্রকাশ: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৮, পৃ. ৪৩-৪৪

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে ছন্দ

'বুদ্ধচরিতম্' কাব্যগ্রন্থের ভাব, ভাষা, বিষয়বস্তুতে অলংকারের মত 'ছন্দ'ও একটি অন্যতম উপকরণ। কারণ তা শব্দকে আচ্ছাদিত ও রূপময় করে। 'ছন্দ'- শব্দটির সাধারণ অর্থ- ছাঁদ বা প্যাটার্ন। অর্থাৎ ধ্বনিপ্রবাহ যখন বিশেষ কোন ছাঁদে বাঁধা পড়ে, তখনই তা কেবলমাত্র ভাবে ভাষায় বর্ণনায়, বন্ধনেও বন্ধহীন গতিতে ছন্দ হয়ে ওঠে। 'ছন্দ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, ছন্দস্+আসুন্-ছন্দঃ। 'ছন্দ' শব্দের অর্থ যার দ্বারা আনন্দ উৎপাদিত হয়। "যেভাবে পদবিন্যাস করলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে আনন্দ জন্মে, তকে ছন্দ বলে"। ব্যাপক অর্থে, ছন্দ সর্বাধিক সুকুমার কলার লক্ষণ। কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কলাতেই দেখা যায়, বিশেষ রীতি অবলম্বন করে উপকরণগুলোর সমাবেশ না করলে মনে রসের সঞ্চার হয় না। এই রীতিকেই rhythm বা ছন্দ বলে। সাধারণত পদ্য কাব্যেই ছন্দের লক্ষণগুলো সর্বাপেক্ষ বেশি এবং স্পষ্টরূপে বর্তমান। "ছন্দোবদ্ধ পদং পদ্যম" অর্থাৎ ছন্দেবদ্ধ পদসমষ্টিই পদ্য। চারটি পদ বা চরণ মিলে একটি পদ্য বা শ্লোক হয়। কাব্য- সাহিত্য ভাল করে বুঝতে হলে এবং কাব্যের রসাস্বাদন করতে হলে, আমাদের ছন্দোজ্ঞান থাকা আবশ্যক। আলঙ্কারিক দন্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে বলেছেন: "মানুষ যেমন নৌকার সাহয্যে রত্ন সংগ্রহ পূর্বক সমুদ্র উত্তীর্ণ হয় সেই প্রকার ছন্দোজ্ঞান দুর্গম কাব্য সাগর উত্তীর্ণ হবার নৌকাস্বরূপ হয়ে থাকে।"[১] আমাদের আলোচিত বিষয় হল 'বুদ্ধচরতম্' কাব্যে ছন্দের ব্যবহার। এ মহাকাব্যে সমবৃত্ত। অর্ধসমবৃত্ত এবং বিষমবৃত্ত প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

সমপাদ/সমবৃত্ত ছন্দ

এক সাথে ব্যবহৃত বা সংযুক্ত পাদ (পদ) সমূহের মাত্রা যদি সমান থাকে তাকে সমপাদ/সমবৃত্ত ছন্দ বলে। যেমন:

চক্ষুনা সংবরো সাধু। সাধু সোতের সংবরো

Dhaka University Institutional Repository

ঘাণেন সংবরো সাধু। সাধু জিব্হায সংবরো।।[২]

অদ্ধসমপাদ/অর্ধসমবৃত্ত ছন্দ

কোন ছন্দ রীতিতে ব্যবহৃত পদ সমূহের মধ্যে যখন দেখা যায় যে, প্রথম পদ তৃতীয় পদের সাথে এবং দ্বিতীয় পদ চতুর্থ পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তখন তাকে অদ্ধসমপাদ/অর্ধসমবৃত্ত বলে। যেমন:

যথাগারং দুচ্ছন্নং। বুট্ঠি সমতিবিজঝতি,
এবং অভাবিতং চিত্তং। রাগো সমতিবিজ্ঝতি।।[৩]

বিস্মপাদ/বিষমবৃত্ত ছন্দ

কোন ছন্দে বা শ্লোকে ব্যবহৃত যখন 'সমাবৃত্ত' ও 'অদ্ধসমাবৃত্ত' রীতির কোনটির সাথে সঙ্গতি বিধান করে না তখন সে পদকে বলা হয় বিস্মপাদ (বিষমপদ)। যেমন:

একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুত্থত্তম্পি পূজযে,
সাযেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্মসতং হুতং।[৪]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়। বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যে উপরে উল্লেখিত ছন্দ গুলোর প্রয়োগ যথাযথ ভাবে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশঃ

১। সংস্কৃত মঞ্জুষা, ড. নিখিল রঞ্জন বিশ্বাস, প্রকাশনায় বেদবানী প্রকাশনী প্রেঃ জুয়েলী বিশ্বাস ২০০৬, পৃ. ৮৮

২। পালি ভাষা সাহিত্য ছন্দ ও অলংকার, ড. সুকোমল বড়ুয়া প্রকাশক গোলাম মঈনউদ্দিন পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৯, পৃ. ৬৪

৩। পালি ভাষা সাহিত্য ছন্দ ও অলংকার, ড. সুকোমল বড়ুয়া প্রকাশক গোলাম মঈনউদ্দিন পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৯, পৃ. ৬৪

৪। পালি ভাষা সাহিত্য ছন্দ ও অলংকার, ড. সুকোমল বড়ুয়া প্রকাশক গোলাম মঈনউদ্দিন পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৯, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের আলোকে 'বুদ্ধচরিতম্' একটি পুনর্মূল্যায়ন গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের সাহিত্য জগতে নতুন, স্বতন্ত্র ও মৌলিকত্বের দাবি রাখে। এ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যেসব বিষয় পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা হলো- বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত, বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক সংকলনের ভূমিকা ও মহাসংগীতি আয়োজনের প্রেক্ষাপট, জাতক কাহিনির ইতিহাস প্রতিভাত করা হয়েছে। বুদ্ধচরিত একটি ঐতিহাসিক কাব্য। বুদ্ধের জীবন চরিতই এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। এ কাব্যের নায়ক রাজকুমার সিদ্ধার্থ। তিনি সৎ বংশজাত ও গুনসম্পন্ন। তাঁর মধ্যে মহাকাব্যে বর্ণিত গুণাবলি নায়ক ত্যাগী, তেজস্বী, পণ্ডিত, উৎসাহী, সুশ্রী, রূপ-যৌবনসম্পন্ন, কৃতী, কুলীন ও সদাচারসম্পন্ন। তিনি বিনয়ী ও দৃঢ়ব্রত এবং কোনো আত্মশ্লাঘা নেই। রসের সমাবেশ মুখ্যরস হিসেবে 'শান্ত' রসই প্রাধান্য পেয়েছে। এছাড়া এতে আদি রসের ব্যবহারও আছে।

বুদ্ধচরিতম্ মহাকবি অশ্বঘোষের শ্রেষ্ঠ কাব্যশৈলী এবং বৌদ্ধ সাহিত্য ভুবনে একটি ঐতিহাসিক কাব্য। মহাকাব্যের অন্তরঙ্গ ও বাহিরঙ্গ সকল প্রকার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য কাব্যটিতে বিদ্যমান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহাকাব্য রীতির অঙ্গ লক্ষণ সমূহ এতে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী, বস্তু নির্দেশ, সর্গ বিন্যাস, ছন্দ, অলংকার, উপমা, রূপক, রসবিচার, চরিত্র রূপায়ন, মহাজীবন, বিশ্বপ্রকৃতি, কাল, বংশ, বর্ণ আবির্ভাব প্রভৃতি বুদ্ধচরিত কাব্যে যথাযথভাবে আলোচিত হয়েছে। মহাকাব্য বুদ্ধচরিতে প্রারম্ভ, গুণকীর্তন, জন্মপর্যায়, জীবনচর্যা, শান্ত-শৃঙ্গার বীর রসের অবতারণা, মহাজীবনে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ এ চতুবর্গের প্রয়োগ, নামকরণ এবং কাব্যের মহত্ত, বিশালতা ও ঐতিহাসিকতা বিদ্যমান। একথায় বুদ্ধচরিতম্ মহাকাব্যের সর্বগুণ ধর্মে পূর্ণাঙ্গ একটি সার্থক মহাকাব্য হিসেবে পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। আশাকরি গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত ও সার নির্যাস গ্রহণ করে আগামীতে নতুন গ্রন্থের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে উপকৃত হবে গবেষক, শিক্ষক, সুধীজন ও শিক্ষার্থী সকলেই।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোষ: বৌদ্ধিক জীবনের নতুন দিগন্ত, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩।

অলংকার প্রদীপ- ড. ঝর্ণা ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৯৪।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন, বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য: মধুসূদন ও অনুসারীবৃন্দ, ১৯৭৯, কলকাতা।

ড. কানাই লাল রায়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, প্রকাশক, মিলন নাথ, অনুপম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা, ১১০০, প্রকাশকাল- ২০১৩।

ড. সুকোমল বড়ুয়া, পালি ভাষা সাহিত্য ছন্দ ও অলংকার, প্রকাশক গোলাম মঈনউদ্দিন পরিচালক, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ বাংলা একাডেমী, ঢাকা- ১৯৯৯।

ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, বুদ্ধচরিতম্, কলিকাতা: সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার, ২০০৮।

জগন্নাথ বড়ুয়া, মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৯।

ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, মহাকবি নাশ্বঘোষেণ রচিতম্ বুদ্ধচরিতম্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮।

ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোসের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা।

ড. দেব কুমার দাস, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৪১২।

ড. বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৭।

ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, কলিকাতা, ১৪০২।

ড. বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, বৌদ্ধ সাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৯৫।

ড. মনিকুন্তলা হালদার দে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৬।

ড. মনিকুন্তলা হালদার দে, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯৯৬।

ড. মাধবী রাণী চন্দ, সাহিত্যদর্পনে অলংকার, ময়না তালুকদার, প্রকাশক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০, প্রথম প্রকাশ: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০০৮।

Dhaka University Institutional Repository

ড. রাধারমণ জানা, পালিভাষা-সাহিত্য বৌদ্ধ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৯৮৫।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভোল্গা থেকে গঙ্গা, প্রকাশকঃ চিরায়ত প্রকাশনী, কলিকাতা।

ড. রাধারমণ জানা, পালি ভাষা-সাহিত্য, বৌদ্ধদর্শন ও রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশকঃ পুস্তক বিপনী, কলিকাতা।

ড. বরীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯

ড. দিলীপ কুমার ও বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া, কীর্তিমান বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা, ২০০৮।

ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা, কলিকাতা: গোস্বামী প্রকাশনী, ১৯৭৭।

ডক্টর রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮০।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকাশকঃ শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি.এম.লাইব্রেবী, ৪২, বিধান সরনী, কলিকাতা- ৬, প্রথম প্রকাশঃ মহালয়া, ১৩৭১।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালির উত্তরাধিকার, প্রকাশক: কলকাতা, ১৩৮৫।

বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা থেকে তারাপদ ভট্টাচার্য, প্রসুন বসু, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, (১১,১৯৮৯ এবং ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১৯৬৩ সালে মুনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বুদ্ধচরিত বাংলায় অনুবাধ করেন।

ফয়েজুন্নেছা বেগম, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৪।

শ্রী বিমলাচরণ লাহা, সৌন্দরনন্দ কাব্য, কোলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৩।

বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৯৫।

মুরারিমোহন সেন, প্রসুন বসু (সম্পা), সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (৯ম খণ্ড), ১৯৮০।

মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভূমিকা বুদ্ধচরিত, ধর্মাংকুর বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৬৩।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৯৯।

রনজিত কুমরা মজুমদার, সংস্কৃত সাহিত্য সংকলন, ষষ্ঠ সং, কাকলি প্রেস, খুলনা, ২০০৭।

Dhaka University Institutional Repository

রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, চট্টগ্রাম, ১৯৪১।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য (যুগের প্রবন্ধে), বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৩৯৪।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রত্নাবসু, শারিপুত্রপ্রকরণ, প্রসূন বসূ (সম্পা,), 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার', নং ১১ (কলিকাতা: নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুদ্ধচরিত, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৩৬।

রত্নাবসু, প্রসুন বসু (সম্পা) শারিপুত্র প্রকরণ, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার (১১ খণ্ড), ১৯৮৯ সালে সম্পাদন করেন।

অধ্যাপক শ্রীমণিন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ), কলিকাতা: ধর্ম্মাঙ্কুর বুক এজেন্সী, ১৩৬৩।

শিশির কুমার দাশ, কাব্যতত্ত্ব, (অনু) প্যাপিরাস কলিকাতা, ১৯৯৯।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত- প্রণীত, মেঘনাদবধ কাব্য, সম্পাদনা, অধ্যাপক শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক, শ্রীসত্যনারায়ন ভট্টাচার্য্য, বি.বি. ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৬/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩।

শ্রী রামচরণ তর্কবাগীশ, সাহিত্য দর্পণঃ শ্রী বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮৬।

সুমন কান্তি বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্য কীতি, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০২, ঢাকা।

সুমন কান্তি বড়ুয়া, বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বৌদ্ধ পারমীতত্ত্ব, পিএইচ,ডি গভেষণা অভিসন্দর্ভ, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।

সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাহা, ১৩৮৬।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

সুধীর কুমার দাসগুপ্ত, কাব্যশ্রী, কলিকাতা, ১৩৭১।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ, ৪র্থ খণ্ড, কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

Dhaka University Institutional Repository

শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা- ১৯৮১।

হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস, প্রকাশকঃ পরিশ্চমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা- ১৯৮৯।

Anukul Chandra Banarjee, Buddhism in India and abroad, Calcutta. 1973.

Ashvaghosha, Deva. Nagarijuna and Kumarlabha-the four suns which illuminate the world', Hinen-tsiang calls (ed. F. Max. Mullar Sacred Books of the East. Vol-49)

T. Suzuki (tms). Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith, (Chicago, OTF. 1990)

E.H Johnston, 'Asvaghosa', Encyclopeadia of Buddhism, (Ceylon: Government Press, 1967), P. 295. The Buddhacarita of Act of the Buddha (Motill), (Delhi Banarasidaa, 1984)

E.H. Johnston, The Buddhacarit or The Acts of the Buddha-Part-II, Delhi, 1987.

Bunyin Nanjio, Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, (Oxford University Press, Oxford, 1833).

Rhys, Davids London, Buddhism, 1903

Davids, Buddhism, Buddhistic Studies, B.C Law, p. 71, Smit: E.H.I, PP. 28/Rhys 1903

Davids, Buddhism, 1903

Debiprasad Chattopadyaya (ed.), Taranatha's History of Buddhism in India, (K.P Bagchi & Company, 1980)

Jagatjyoti, Buddhajayanti Number, 1956

Nalinakha Dutta, Early Monastic Buddhism, Calcutta Oriental Book Agency, Calcutta, 1941

Nalinaksha Datta. Mahayana Buddhism Calcutta. 1985.

Dhaka University Institutional Repository

J.K. Nariman, Literary History of Sanskrit Budhism, Publishers: Motilal Banarsidass. India

Rabindra Bijay Barua, The Theravada Sangha, The Asiatic Society of Bangladesh, 1978

Sukumar Sen, An outline syntax of Buddhistic Sanskrit, Journal of the Department of Letters, Vol. XVII, Calucutta University Press, 1928

Dr. Sumangal Barua, Buddhist Council and Development of Buddhism, Calcutta, 1997

Dr. Sumangal Barua, The Buddhist Council and Development of Buddhism, Calcutta, 2005

M Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. I.

M. Winternitz, A History of Indian Literature, Vol. II, Delhi, 1999

Professor Sujit Kumar Mukhopadhaya, The Vajrasuci of Asvaghosa published by Sino Indian. Cultural Society Santiniketan, India, V. 30.

E.H. Johnston, Delhi, 1987,

The Buddhacarit or The Acts of the Buddha-Part-II,

পত্রিকা

কলা অনুষদ পত্রিকা, জুলাই ২০০৫- জুন ২০০৬, প্রবন্ধ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, সংস্কৃত আলঙ্কা রিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যায়ন।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৯০২), সুমন কান্তি বড়ুয়া, 'মহাকবি অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকীর্তি'।

বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৮বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৪, ঢাকা। প্রবন্ধ: ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা।

Dhaka University Institutional Repository